৩৭-৩৮ দুই খণ্ড একত্রে
বাংলাপিডিএফ
দস্যু বনহুর
গুপ্ত রহস্য
কিউকিলা ও দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ
রনি

গুপ্ত রহস্য-৩৭
কিউকিলা ও দস্যু বনহুর-৩৮

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

কখন যে পাঠান ড্রাইভার এসে দাঁড়িয়েছে একটুও বুঝতে পারেননি মিঃ আহাদ, তিনি প্রথমে হতভম্ব হলেন কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন—তোমার অসুখ সেরে গেছে?

হাঁ বাবুজী! আপ কাঁহি যায়েঙ্গে?

হাঁ চলো।

চলিয়ে বাবুজী।

মিঃ আহাদ বেরিয়ে আসতেই পাঠান ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলো, গাড়ির পিছন আসনের দরজা খুলে ধরলো সে।

গাড়িতে উঠে বসলেন মিঃ আহাদ, স্থিরকণ্ঠে বললেন—গ্রীন-হাউস নাইট ক্লাবে চলো।

বহুৎ আচ্ছা বাবুজী।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো পাঠান ড্রাইভার।

ঢাকার রাজপথ বেয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। মিঃ আহাদ পিছন আসনে ঠেশ দিয়ে বসে আছেন, ললাটে তাঁর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে। সিগারেট পান করছেন তিনি।

হঠাৎ একসময় বলে উঠে পাঠান ড্রাইভার—বাবুজী, ওহি ক্লাব তো আচ্ছি নেহি!

কেন? সোজা হয়ে বসলেন মিঃ আহাদ।

বহুৎ খারাব কাম হোতা হয়......

তুমি কেমন করে জানলে?

পাঠান ড্রাইভার ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলার চেষ্টা করলো—হামি একবার ওহি ক্লাব মে দারওয়ান থা।

দারওয়ান ছিলে তুমি?

হাঁ বাবুজী। একটু নীরব রইলো ড্রাইভার তারপর বললো—বাবুজী, আভি এক বাৎ হাম আপকো কহেগা।

বলো কি বলতে চাও? বললেন মিঃ আহাদ।

পাঠান ড্রাইভার সম্মুখে দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলো, বললো—আপকো পুলিশ অফিসমে একবার যানে হোগা।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন মিঃ আহাদ—পুলিশ অফিস?

হাঁ বাবুজী! হাম এক জরুরি বাত আপকো শুনায়েঙ্গে, যো বাত শুনকে আপকা আঁখে খুল যায়েগী বাবুজী। বহুৎ জরুরি বাত.........

বলো কি বলতে চাও তুমি?

আভি সব বাত নেহি খোলাসা কাহুংগা বাবুজী, সব বাত আপ আঁখে সে দেখলিযেগা। আভি আপ পুলিশ ফোর্স লেকর হামারা সাত গ্রীন হাউস নাইট ক্লাব মে চলিয়ে।

ব্যাপার কি বলবে তো?

আভি নেহি, সবকুছ আপ সামঝেঙ্গে।

মিঃ আহাদ অভিজ্ঞ গোয়েন্দা, তিনি প্রথম থেকেই ব্যাপারখানা রহস্যময় বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি পাঠান ড্রাইভারের কথামতই কাজ করলেন। বললেন মিঃ আহাদ—চলো, পুলিশ অফিসেই চলো।

পুলিশ অফিসে পৌঁছে মিঃ আহাদ ইন্সপেক্টর মিঃ হাফিজকে কিছুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স নিয়ে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

মিঃ হাফিজ কিছু বুঝতে না পারলেও তিনি এটা বুঝলেন যে, বিশেষ কোনো প্রয়োজন ঘটেছে, যার জন্য সশস্ত্র পুলিশ ফোর্সের দরকার। ইন্সপেক্টর মিঃ আহাদের কথামত কাজ করলেন।

ইন্সপেক্টর হাফিজ এবং প্রায় বিশ-পঁচিশজন সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স নিয়ে রওয়ানা দিলেন গ্রীন হাউস নাইট ক্লাবের দিকে।

মিঃ আহাদ হাতঘড়ি দেখে নিলেন, রাত সাড়ে দশটার বেশি হয়ে গেছে। মিঃ আহাদের গাড়িতে বসেছেন মিঃ হাফিজ এবং দু'জন ওসি।

পিছনের গাড়িখানা পুলিশ ভ্যান। প্রত্যেকটা পুলিশ সতর্ক এবং সজাগভাবে গুলীভরা রাইফেল হস্তে দন্ডায়মান রয়েছে।

পাঠান ড্রাইভার স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে, তারই পরিচালনায় আজ মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজ এবং পুলিশ বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে।

মিঃ আহাদ জীবনে বহু দস্যু-ডাকু এবং ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ লোককে গ্রেফতার করেছেন, কিন্তু আজকের মত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না। অত্যন্ত উদগ্রীবভাবে বসে আছেন তিনি পিছন আসনে ঠেশ দিয়ে। গাড়িতে বসেই তিনি একবার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারখানার অস্তিত্ব অনুভব করে নিয়েছিলেন। পাঠান ড্রাইভারের কোনো কু' অভিসন্ধি থাকলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না—এটাও নির্ভুল।

মিঃ আহাদ আপন মনে সিগারেট পান করছিলেন বটে কিন্তু তার লক্ষ্য ছিলো সর্বদা ড্রাইভারের হস্তদ্বয়ের উপরে—কোনোরকম শয়তানি নিয়ে

ড্রাইভার তাদের যদি বিপদে ফেলতে চেষ্টা করে তাহলে প্রথমে ওর হাত দু'খানাই জখম হবে।

গাড়িতে বসে কারো মুখে কোনো কথা ছিলো না। বিশেষ করে মিঃ আহাদ নিশ্চুপ ছিলেন বলেই মিঃ হাফিজ এবং ওসিদ্বয়ও নীরব ছিলেন।

মিঃ আহাদের ষ্টুডি কমান্ডার গাড়িখানা হাওয়ার বেগে ছুটছে। পথে জনগণ এবং যানবাহন এগিয়ে দক্ষহস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলো পাঠান ড্রাইভার।

গাড়ির মধ্যে প্রত্যেকেই কিছু একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। সেটা যে কি তা কেউ সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন না। মিঃ আহাদের ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে আসছিলো, মাঝে মাঝে মুখমন্ডল অত্যন্ত গম্ভীর মনে হচ্ছিলো!

বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি ছোটার পর গ্রীন হাউস নাইট ক্লাবের সবুজ আলোকরশ্মির কিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হলো। এবার পাঠান ড্রাইভারের হাতে ষ্টুডি কমান্ডারের গতিবেগ মন্থর হয়ে এলো। পাঠান ড্রাইভার গাড়ির মুখ গ্রীন হাউসের পিছন দিকে মোড় ফিরিয়ে একটা ছোট গলির মধ্যে প্রবেশ করলো।

গলিটা সম্পূর্ণ নির্জন বলেই মনে হলো। কতকগুলো চুন-বালি খসা পুরোন বাড়ি। রাস্তায় ডাষ্টবিনের দুর্গন্ধ আসছে। সম্মুখ গাড়িখানা থেমে পড়তেই পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো পুলিশ ভ্যানখানা।

দিনের বেলা হলে চারপাশে লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে কানাঘুষা শুরু করতো—ব্যাপার কি, এখানে পুলিশ ভ্যান কেন? রাত দশটার পর এ গলিতে লোকজন বড় একটা দেখা যায় না, তবে যারা এ গলিতে বাস করে অথচ কাজ করে শহরের কোনো কল-কারখানায় কিংবা কোনো দোকানে, তারাই শুধু এতো রাতে এ গলিপথে আনাগোনা করে থাকে।

আজ রবিবার, তাই গলিটা একেবারে সম্পূর্ণ নীরব। কারণ কল-কারখানা সব বন্ধ, কুলী-মজুর বা মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী—তারাও আজ ছুটি পেয়ে সকাল সকাল নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়েছে, ভোর পর্যন্তই যা আরাম করবে, তারপর আবার শুরু হবে কাজ।

কোনো কোনো জীর্ণ অট্টালিকার অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছে ছোট্ট শিশুর তীব্র কান্নার আওয়াজ। হয়তো ক্ষুধার্ত শিশু নিদ্রিত মায়ের বুকে খাদ্যের অন্বেষণ করছিলো, জননী বিরক্ত হয়ে বসিয়ে দিয়েছে দু'ঘা। কলরব করে কেঁদে উঠে শিশুটা, পরক্ষণেই আবার থেমে যায়, হয়তো জননী আদর

করে টেনে নিয়েছে কোলের মধ্যে, শুকনো স্তনটা ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখে গুঁজে দিয়ে বৃথা চেষ্টা করছে তাকে চুপ করাবার।

দু'ধারে বিরাট উঁচু দেয়াল, মাঝখানে খানটুকুর আকাশ দেখা যায়। এসব বাড়ির বাসিন্দারা বদ্ধ দেয়ালের নাগপাশে যখন অতিষ্ট হয়ে উঠে তখন হয়তো এসে দাঁড়ায় এই পথটুকুর মধ্যে। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে চায়, মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে চায় অন্তর দিয়ে।

ডাষ্টবিনের দুর্গন্ধে নাড়ী যেন বেরিয়ে আসতে চায়। মাছের আঁশ আর মুরগীর পঁচা নাড়ীভুড়ির ভ্যাপসা গন্ধ একেবারে যেন অসহ্যনীয়।

পাঠান ড্রাইভারের পরিচালনায় নেমে পড়লেন মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজ, ওসিদ্বয় এবং পুলিশ বাহিনী।

ড্রাইভার বললো চাপা কণ্ঠে—বাবুজী, আপলোগ মেরা সাথ আইয়ে। আওর পুলিশ লোক চুপি চুপি নাইট ক্লাব কি চার পাশমে ছুপা রহেগা। বহুৎ হুসিয়ারিসে কাম করনে হোগি বাবুজী। পুলিশ লোক এক সাথে কাভি নেহি যায়েগা। সব লোক আলাদা আলাদা ভিন্ ভিন্ রহেগা। যব হুইসেল কি আওয়াজ হোগি তব পুলিশ ফোর্স নাইট ক্লাব কি অন্দর যায়েগা। যাও পুলিশ ভাই, তুমলোগ নিজ নিজ কাম করো। আইয়ে বাবুজী, আপলোগ মেরা সাথ আইয়ে। দেখিয়ে বহুৎ হুশিয়ার.......

মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজ এবং ওসিদ্বয় অনুসরণ করলেন পাঠান ড্রাইভারকে।

পুলিশগণ ততক্ষণে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, সবাই চলে গেছে তাদের গন্তব্য স্থানের দিকে।

একটা নিকৃষ্ট গলির মধ্যে দিয়ে পাঠান ড্রাইভার মিঃ আহাদ এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে নিয়ে এগিয়ে চললো। এ গলিটা বিভিন্ন বাড়ির পিছনের আবর্জনাপূর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ। অতি কষ্টে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছিলেন।

শহরের এঁদোগলি পথ এতো জঘন্য নোংরা কল্পনা করা যায় না, পথের মধ্যে স্তূপাকার আবর্জনা আর ময়লা। বিশ্রী গন্ধে যদিও বমি বমি ভাব লাগছিলো তবু নীরব ছিলো সবাই। কারণ একে গভীর রাত, তারপর এই নোংরা পথে ভদ্রলোকদের দেখলে ব্যাপার সন্দেহজনক না হয়ে যাবে না।

বেশ কিছুক্ষণ আঁকাবাঁকাভাবে চলার পর হঠাৎ তাদের কানে ভেসে এলো অর্কেষ্ট্রার সুমিষ্ট আওয়াজ। তাহলে তারা কি ঠিক গ্রীন হাউসের সীমানার অদূরে এসে পড়েছেন।

এখনও তেমন কোন আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হয়নি। এসব গলি-পথ একেবারে অন্ধকার! কোনোরকম আলোর ব্যবস্থা এখনও হয়নি এসব পথে। তবে মাঝে মাঝে সেকেলে পুরোন লণ্ঠনযুক্ত লাইট পোষ্টের কঙ্কালখানা কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অকেজো বস্তু হয়ে।

মিঃ আহাদ এবং মিঃ হাফিজ ক্ষুদে টর্চ দিয়ে চলার পথ সহজ করে নিচ্ছিলেন।

আর কিছুটা এগুলেই অর্কেষ্ট্রার সুর স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো। দু'পাশের উঁচু প্রাচীরের ফাঁকে সবুজ আলোর ছটাও নজরে পড়লো তাদের। বিরাট একটা দেয়ালের পাশে এসে থেমে পড়লো পাঠান ড্রাইভার।

মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজ এবং ওসিদ্বয়ও দাঁড়িয়ে পড়লেন। সবাই একবার নিজ নিজ পকেটে হাত রেখে আগ্নেয় অস্ত্রের অস্তিত্ব অনুভব করে নিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন এবং ভালভাবে বুঝতে পারলেন, নাইট ক্লাবের পিছনে এখন তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন।

পাঠান ড্রাইভার মিঃ আহাদের হাত থেকে ক্ষুদে টর্চটা নিয়ে বিরাট উঁচু দেয়ালটার নীচে আলো ফেলে পাশ কেটে এগুতে লাগলো.।

একটা ছোট্ট দরজার মত জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো ড্রাইভার। দেয়ালে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো, স্পষ্ট দেখা গেলো কয়েকটা সরু সিঁড়ির ধাপ।

ড্রাইভার বললো—আপলোক আইয়ে বাবুজী।

মিঃ আহাদ ভড়কে না গেলেও মিঃ হাফিজ এবং অফিসারদ্বয় ঘাবড়ে গেলেন ভিতরে ভিতরে। মিঃ আহাদ নীরবে অনুসরণ করছেন বলে তাঁরাও কোনোরকম উক্তি উচ্চারণ করলেন না।

সিঁড়ির ধাপগুলো ধূলোবালি আর নোংরা জিনিসে ভরা। কতদিন যেন এ সিঁড়ির ধাপে মানুষের পা পড়েনি। সিঁড়ির ধাপগুলো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং খাড়া, জমাট অন্ধকারও বটে।

ক্লাব-কক্ষ হতে নানারকম বাজনার চাপা সুর শোনা যাচ্ছিলো, তবে স্পষ্ট নয়।

সিঁড়ির ধাপে পাশাপাশি চলবার উপায় নেই।

পাঠান ড্রাইভার ও মিঃ আহাদ চলেছেন আগে, পরে মিঃ হাফিজ, তার পরে ওসিদ্বয় আগাপাছা করে এগুচ্ছে। দুর্গম পথের মতই সিঁড়িটা ভয়ঙ্কর

মনে হচ্ছিলো। পাঠান ড্রাইভার অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে মাঝে মাঝে পেনসিল টর্চটা জ্বেলে সিঁড়ির ধাপগুলো দেখে নিচ্ছিলো।

ড্রাইভারের মুখেও কোনো কথা নেই, ইংগিতে সে পিছনের সবাইকে উঠে আসার জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলো।

সিঁড়িখানা কিছুদূর এগুনোর পর বামদিকে মোড় ফিরেছে—এখন আরও জমাট অন্ধকার মনে হচ্ছিলো, সিঁড়ির নীচে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোনো যন্ত্র বা মেশিনের আওয়াজ হবে। আরও এক রকম খট্ খট্ শব্দ বেশ থেমে থেমে শোনা যাচ্ছিলো। মিঃ হাফিজ চাপা স্বরে বললেন—ক্লাব-কক্ষে মেশিনের আওয়াজ—ব্যাপার কি?

পাঠান ড্রাইভার ঠোঁটে আংগুল-চাপা দিয়ে চুপ থাকার জন্য ইংগিত করলো।

সিঁড়িটা সোজা বাম দিকে কিছুটা এগিয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে, পাঠান ড্রাইভার বললো—বাবুজী বহুৎ হুঁশিয়ার......

মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজ এবং ওসিদ্বয় সর্তক ছিলেনই, আরও ভাল-ভাবে লক্ষ্য রেখে এগুতে লাগলেন। সিঁড়ির ধাপগুলো সঙ্কীর্ণ এবং নোংরা হওয়ায় চলতে তাঁদের খুব কষ্ট হচ্ছিলো। অত্যন্ত গরম বোধ করছিলেন তাঁরা।

মিঃ হাফিজ, মিঃ আহাদের কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন—ড্রাইভারের কোনো কু'মতলব নেই তো?

দেখতে দিন কি ঘটে।

সিঁড়ির ধাপগুলো নীচে এসে একটা অন্ধকার সমতল জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। জায়গাটা কোনো কক্ষ বা কুঠরী হবে।

এ জায়গাটা এতো বেশি অন্ধকার যে, নিজের হাতখানাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এ-ওর গায়ে ধাক্কা লেগে যাচ্ছিলো বারবার। সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন তারা—ওদিকের অন্ধকারে দু'টো চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

ভালভাবে লক্ষ্য করতেই সন্দেহ দূর হলো, দেয়ালের গায়ে যে দুটো চোখ জ্বলছে আসলে তা চোখ নয়, দুটো ছিদ্রপথ। ছিদ্রপথ দু'টি দিয়ে ওপাশের তীব্র আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছিলো।

পাঠান ড্রাইভার মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজকে ইংগিত করলো ঐ ছিদ্রপথে দৃষ্টি রাখতে। যে ঘড়ঘড় শব্দটা তাঁরা সিঁড়িপথে শুনতে পাচ্ছিলো এখন সে শব্দ আরও কিছুটা স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছিলো।

শব্দটা অত্যন্ত চাপা এবং অল্প, অতি নিকটে না এলে শোনা যায় না—সিঁড়ির ধাপ থেকেও তেমনি মৃদুভাবে তাঁরা শুনেছিলেন। কেমন মেশিনের শব্দ এটা সহজে বুঝা মুস্কিল।

মিঃ আহাদ আর মিঃ হাফিজ পাঠান ড্রাইভারের ইংগিতে ঐ ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বিস্ময়ে চমকে উঠলেন তাঁরা। উভয়ে একসঙ্গে দেখলেন—ওপাশে একটা মাঝারি ধরনের কক্ষ, কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কক্ষের চারপাশে কতকগুলো যন্ত্রপাতি আর অদ্ভুত ধরনের কয়েকটা মেশিন। মাঝখানে একটা বড় জমকালো পাথরে তৈরি টেবিল। টেবিলের পাশে বসে আছে একটা আলখেল্লা পরা মানুষ। সমস্ত শরীর তার জমকালো পোশাকে ঢাকা, এমনকি মাথাটাও ঢাকা পড়েছে আলখেল্লার নিচে। চোখের কাছে দুটো ফুটো, ফুটো দুটো যেন কেমন অদ্ভুত ধরনের।

মিঃ হাফিজ মিঃ আহাদের গায়ে হাত দিয়ে চাপ দিলেন।

মিঃ আহাদ তাঁকে নিঃশব্দে দেখতে বলে নিজেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলেন।

দেয়ালের পাশের মেশিন আর যন্ত্রগুলো অদ্ভুত ধরনের। এমন মেশিন এবং যন্ত্রপাতি তাঁরা কোনোদিনই দেখেননি। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখছেন মিঃ আহাদ আর মিঃ হাফিজ। দেয়ালের ধারে দক্ষিণ পাশের একটা মেশিনের নিচে একটা লোক শুয়ে আছে, মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন এ্যাপ্রন-পরা লোক—হাতে গ্লবস্, মুখে মাস্ক—কি যেন করছে তারা। একি, শায়িত লোকটা রামসিং বলে মনে হচ্ছে! এ্যাপ্রন-পরা লোক দু'জন রামসিং-এর মুখের মধ্যে একটা রাবারের পাইপ মেশিনের দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দিলো। তারপর মেশিনের একটা মুখের মত ফাঁকে কি যেন ঢেলে দিচ্ছে লোক দু'জন। এক ইঞ্চি লম্বা আর আধা ইঞ্চি চওড়া চকচকে জিনিসগুলো। মিঃ আহাদ চাপা স্বরে বললেন—সোনা চালান করা হচ্ছে।

মিঃ হাফিজ অস্ফুট শব্দ করলেন—সোনা?

হাঁ, চুপ করে দেখুন।

পাঠান ড্রাইভার অত্যন্ত চাপাস্বরে বললো—বাত মত কহিয়ে বাবুজী।

মিঃ আহাদ ও মিঃ হাফিজ সজাগ হলেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন—পাঠান ড্রাইভার তাদের পিছনেই রয়েছে। মিঃ হাফিজের মনে অনেকটা

বিশ্বাস এসেছে এখন, পাঠান ড্রাইভার তাহলে তাদের কু'মতলব নিয়ে আসেনি! গভীর কোনো রহস্য উদঘাটনেই সে তাদের সাহায্য করে চলেছে।

রামসিং এবার উঠে দাঁড়ালো।

দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে পুনরায় মেশিনের নিচে রামসিং-এর মত করে শুইয়ে দেওয়া হলো। এ লোকটা রামসিং-এর মত মোটা নয় তবে বেশ লম্বা এবং বলিষ্ঠ। লোকটার মুখেও মেশিন দ্বারা রবারের পাইপ প্রবেশ করানো হলো, তারপর কয়েক মিনিট ধরে কতকগুলো সোনার টুকরা স্তরে স্তরে সাজানো হলো লোকটার পেটের মধ্যে।

এবার মিঃ আহাদ এবং মিঃ হাফিজের দৃষ্টি পড়লো পাশের একটা মেশিনের দিকে, চমকে উঠলেন উভয়ে—দেওজী মেশিনটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কখন যে আলখেল্লাধারী গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেওজীর পাশে তারা খেয়াল করেনি। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য—সেই মেশিনটার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে রামসিং, দেওজীর প্রধান কর্মচারী সে। মিঃ আহাদ আর মিঃ হাফিজ তাকে দেওজীর ওখানেই দেখেছিলেন।

লোকটাকে সেই অদ্ভুত মেশিনের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিতেই মেশিনটা তাকে টেনে নিলো ভিতরে।

মিঃ আহাদ আর মিঃ হাফিজ চমকে উঠলেন, রামসিংকে হত্যা করা হবে নাকি? কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা আশ্বস্ত হলেন, মেশিনের মধ্যে রামসিং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আলখেল্লাধারী মেশিনের কোনো একটা সুইচে হাত রাখলো, সঙ্গে সঙ্গে নীলাভ এক আলোকরশ্মি রামসিং-এর দেহ ভেদ করে বেরিয়ে এলো।

দেওজী আর আলখেল্লাধারী চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখলো কিছুক্ষণ, তারপর পুনরায় আলখেল্লাধারী সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিলো।

এতো তীব্র আর গভীর আলোকরশ্মি যে, মিঃ আহাদ এবং মিঃ হাফিজের চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে দিয়েছিলো। তাঁরা কিছুক্ষণের জন্য ছিদ্রপথ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটার উদরে তখন পাইপ প্রবেশ করানো হয়েছে। কয়েক মিনিট পর তাকেও দ্বিতীয় মেশিনের আলোকরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা হলো সোনার স্তরগুলো পেটের মধ্যে ঠিকভাবে বসানো হয়েছে কিনা।

এবার দেওজী আর আলখেল্লাধারী টেবিলের পাশে চেয়ারে এসে বসলো। মাঝে মাঝে অত্যন্ত সতর্কভাবে কান পেতেও স্পষ্ট কিছু শুনতে পাচ্ছিলেন না।

পূর্বদিকে একটা মেশিন চলছিলো, তারই শব্দ হচ্ছিলো ঘড় ঘড় করে। মেশিনটা ঠিক আঁখমাড়া মেশিনের মত কিন্তু আকারে অনেক বড়। সেই মেশিনটার পাশেও দু'জন এ্যাপ্রন-পরা লোক কাজ করছে, তবে তাদের মুখে মাক্স বা হাতে গ্লাভ্‌স্‌ নেই। কি যেন তৈরি হচ্ছে বলে মনে হলো সেখানে। মিঃ আহাদ বললেন—সোনার টুকরোগুলোকে চৌকা বানানো হচ্ছে এবং মসৃণ করা হচ্ছে। কারণ এগুলো লোকের পেটের মধ্য দিয়ে বিদেশে চালান হবে।

আরও কয়েকটা মেশিন চালু অবস্থায় রয়েছে, এসব মেশিনে কি কাজ হচ্ছে, বুঝতে পারলেন না তারা। তবে বুঝতে পারলেন, এতোক্ষণ সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির উপরে চলতে চলতে যে শব্দ তারা শুনতে পেয়েছেন সে শব্দ এইসব যন্ত্রদানবের কর্কশ আর্তনাদ।

মিঃ আহাদ আর মিঃ হাফিজ যখন এসব দেখছেন, পাশে দাঁড়িয়ে ওসিদ্বয় আর পাঠান ড্রাইভার অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছে। হঠাৎ শোনা যায় অন্ধকার সঙ্কীর্ণ সিঁড়িপথে জুতোর শব্দ।

আঁতকে উঠলেন তাঁরা।

অন্ধকারেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

পাঠান ড্রাইভার অত্যন্ত নিম্নস্বরে বললো—বাবুজী, কোই আদমী ইধার আতা হায়।

মিঃ হাফিজ বললেন—এখন উপায়?

পাঠান ড্রাইভার বললো—আপলোক আন্ধা কুঠিমে চুপচাপ রহেঙ্গে। জো আদমী আতা হাম উছিকো সাথ সামঝায়েঙ্গে। কথাটা বলে সে অন্ধকারে সিঁড়ির মুখে একপাশে আত্মগোপন করে দাঁড়ালো।

মিঃ আহাদ রিভলভারখানা বাগিয়ে ধরলেন।

মিঃ হাফিজ ও ওসিদ্বয় আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত রইলেন!

সিঁড়ির ধাপে কেউ যেন এগিয়ে আসছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে অন্ধকারে চারটি প্রাণী।

জুতোর শব্দটা আরও নিকটে মনে হচ্ছে, অতি দ্রুত কেউ এগিয়ে আসছে যেন। পাঠান ড্রাইভার মিঃ আহাদকে লক্ষ্য করে বললেন খুব নিম্নস্বরে—বাবুজী, আপ মেরা সাথ আইয়ে, জলদী আইয়ে—

সিঁড়ি বেয়ে ড্রাইভার এবার উপরে উঠতে লাগলো। মিঃ আহাদ অনুসরণ করলেন তাকে। কিছুটা উপরে উঠার পর যে স্থানে সিঁড়ি বাঁক হয়ে অন্যদিকে ফিরেছে সেই স্থানে এসে পাঠান ড্রাইভার দেয়াল ঘেষে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালো।

মিঃ আহাদ পাঠান ড্রাইভারের নিকট হতে প্রায় সিঁড়িকয়েক নীচে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

জুতোর শব্দটা তখন একেবারে পাঠান ড্রাইভারের সম্মুখে এসে পড়েছে। কেউ যেন নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে আসছে সহজভাবে। মিঃ আহাদ এবং তাঁর সঙ্গিগণ ভীষণ একটা মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা শব্দ হলো, ক্যাঁক করে উঠলো যেন কেউ, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চুপ। মৃদু ধস্তাধস্তির শব্দ হচ্ছে সিঁড়ির বাঁকে।

মিঃ আহাদ আরও কয়েক ধাপ এসে ক্ষুদে টর্চটা জ্বালালেন, সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হতবাক হলেন—একটা ভীষণ চোহারার লোককে পাঠান ড্রাইভার পিছন থেকে গলা টিপে ধরেছে, লোকটার চোখ দু'টি বলের মত ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন, জিভটা বেরিয়ে এসেছে আধহাত।

পাঠান ড্রাইভারের কঠিন বাহুর নিষ্পেষণে ভীষণ চেহারার লোকটার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে বিলম্ব হলো না। এবার পাঠান ড্রাইভার আলগোছে লোকটাকে শুইয়ে দিলো সিঁড়ির ধাপে, কতকটা বসার মত করে।

মিঃ আহাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ততক্ষণে মিঃ হাফিজ আর থানা অফিসারদ্বয়। সকলের চোখেমুখে বিস্ময়—আশ্চর্য শক্তি পাঠান ড্রাইভারের দেহে! তাছাড়া তার বুদ্ধি-কৌশল সবাইকে যেন আড়ষ্ট করে ফেলেছে।

পাঠান ড্রাইভার দ্রুত হস্তে লোকটার পকেট হাতড়ে চললো। মিঃ আহাদ টর্চটা তখনও ধরে আছেন পাঠান ড্রাইভার এবং প্রাণহীন মৃতদেহটার উপর! কারো মুখে কোনো কথা নেই, সবাই যেন থ' মেরে গেছেন।

পাঠান ড্রাইভার লোকটার পকেট হাতড়ে একটা অটোম্যাটিক ল্যুগার পিস্তল আর একটা ক্ষুদে ওয়্যারলেস বের করে নিলো আর পেলো একটি

চিঠি। পাঠান ড্রাইভার জিনিসগুলো নিয়ে ফিরে এলো মিঃ আহাদের পাশে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে—হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে পিস্তল আর ওয়্যারলেসটা মিঃ আহাদের হাতে দিলো, তারপর টর্চের আলোর সামনে মেলে ধরলো কাগজখানা। খাঁটি বাংলায় লেখা। পাঠান ড্রাইভার বাংলা জানে না তাই চিঠিখানা মিঃ আহাদের হাতেই দিয়ে বললো—আপ পড়িয়ে বাবুজী, হাম সামঝাতা নেহি।

মিঃ আহাদ পিস্তল এবং ওয়্যারলেসটা পকেটে রেখে চিঠিখানা টর্চের আলোর নিচে মেলে ধরলেন, স্পষ্ট বাংলায় লেখা—

সদরঘাটে নৌকা তৈরি আছে। লাশের কফিন এলেই
আমরা নৌকা ছাড়বো। মনে রেখো, পুরো দশ পাউন্ড
যেন লাশের পেটে থাকে। অতি সাবধানে কাজ
করবে—হুশিয়ার, যেন দস্যু বনহুর টের না পায়।

—বাঞ্ছারাম

মিঃ আহাদ যখন চিঠিখানা টর্চের আলো ফেলে পড়ছিলেন তখন পাঠান ড্রাইভার ঝুঁকে দেখছিলো লেখার অক্ষরগুলো। মিঃ আহাদ পড়া শেষ করে চিঠিখানা পকেটে ভাঁজ করে রাখলেন, তারপর ফিরে এলেন পুনরায় সেই ছোট্ট কুঠরীটার মধ্যে।

মিঃ আহাদ ও মিঃ হাফিজ ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পূর্বে পাঠান ড্রাইভার একবার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছিলো। প্রথম ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মিঃ আহাদ।

মিঃ হাফিজও দ্বিতীয় ছিদ্রপথে চোখ রাখলেন।

এবার দেখলেন, আরও কয়েকজন লোক কক্ষটার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। আলখেল্লাধারী দাঁড়িয়ে তাদের কি যেন বলছে। প্রত্যেকটা লোকের চেহারা ভয়ঙ্কর গুন্ডাষন্ডা রকমের, প্রায় জনেরই বড় বড় গোঁফ আছে।

মিঃ আহাদ ও মিঃ হাফিজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। এমন ধরনের ভয়ঙ্কর কার্যকলাপের সঙ্গে তারা যেন ইতিপূর্বে জড়িত হননি কখনও। মিঃ আহাদ কত দুর্ধর্ষ দস্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন কিন্তু এমন রহস্যময় অবস্থায় পড়েননি।

মিঃ আহাদের কানে গেলো আলখেল্লাধারীর চাপাকণ্ঠ—ইলিয়াস এখনও এলো না কেন?

অন্য একজন বললো—হুজুর, আপনি মাল তৈরি করে নিন, এক্ষুণি এসে পড়বে হয়তো।

দেওজী একটা এটাচী ব্যাগ থেকে গাদা গাদা একশত টাকার ফাইল বের করে আলখেল্লাধারীর সম্মুখে জমকালো পাথরের টেবিলটার উপর সাজিয়ে রাখতে লাগলো।

আলখেল্লাধারী তার সম্মুখের ভীষণ চেহারার লোকটার দিকে তাকিয়ে কিছু ইংগিত করলো।

লোকটা বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

আলখেল্লাধারী এবার টাকার ফাইলগুলো গুণে দেখতে শুরু করে দিলো।

পাঠান ড্রাইভার তখন ওদিকের একটা ফাঁকে দৃষ্টি রেখে দেখছে। এতোক্ষণ এ ফাঁকটা তাঁরা লক্ষ্য করেননি।

ওসিদ্বয়ও পাঠান ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ওপাশের বিস্ময়কর কার্যকলাপগুলো।

❑

নূরী কোনোদিন এমন আনন্দ-মুখর দৃশ্য উপভোগ করেনি, সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলো। অর্কেষ্ট্রার সুন্দর সুমিষ্ট বাদ্য, পিয়ানো আর বাঁশী তাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিলো। টেবিলে তার খাবার পড়ে আছে—অবাক হয়ে দেখছে সে। সমীরের কথায় মাঝে মাঝে খাবারে হাত দিচ্ছে বটে কিন্তু কতটুকু তার মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করছে সে নিজেই জানে না।

ক্লাব-কক্ষে কাঁটা-চামচের শব্দ আর নারী-পুরুষের হাসি-গল্পের শব্দ অর্কেষ্ট্রাবাদ্যের সঙ্গে মিলে অদ্ভুত এক পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছিলো। মিসেস শোহেলী প্রতিটি টেবিলে অতিথিদের পাশে দাঁড়িয়ে আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলো।

অল্পক্ষণ পূর্বে মিসেস শোহেলী স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে ড্রেস পরিবর্তন করে এসেছে। এখন তার দেহে গাঢ় লাল শাড়ি, ব্লাউজটাও লাল টকটকে। এমনকি মাথার ফিতা থেকে হাতের রুমালখানাও লাল। জুতো জোড়াও লাল রং-এর। গাঢ় লালের মাঝে যেন একটা গোলাপ ফুলের মতই লাগছে আজ শোহেলীকে। মিসেস শোহেলীর পাতলা ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপষ্টিক। সরু আংগুলের নখগুলি লাল নেল পলিশে রাঙানো। অপূর্ব লাগছে আজ তাকে।

গ্রীণ হাউসের সবুজ আলো ছটা মিসেস শোহেলীর লাল পরিচ্ছদটাকে মায়াময় করে তুলছিলো। ক্লাব-কক্ষের প্রত্যেকেরই দৃষ্টির আকর্ষণ করছিলো মিসেস শোহেলী। যে-কোনো পুরুষের কাছেই সে কামনার তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যদিও গ্রীণ হাউস নাইট ক্লাবের প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে মিসেস শোহেলীর তেমন কোনো পরিচয় নেই, তবু সে হেসে হেসে প্রত্যেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলো। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ তাকে বেশি হাস্যোজ্জ্বল মনে হচ্ছিলো।

মিসেস শোহেলীর বাম হস্তের ফাঁকে একটি গাঢ় লাল ভ্যানিটি দুলছিলো। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো ভ্যানিটির গায়ে একটি লাল পাথর। ঠিক ভ্যানিটির মুখের কাছে বসানো ছিলো পাথরটা।

গ্রীণ হাউসের সবুজ আলোকরশ্মি পাথরের গায়ে যেন ঠিকরে পড়ছিলো। মূল্যবান পাথর সেটা তাতে কোনো ভুল নেই।

খাওয়া-দাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

মিঃ নিজাম হোসেন—মিসেস শোহেলীর বৃদ্ধ স্বামী আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত,তিনি বেশিক্ষণ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি, বিশ্রামের জন্য মিঃ নিজাম ক্লাবের ভিতরে চলে গিয়েছেন। কাজেই মিসেস শোহেলীকে সবদিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হচ্ছে, আজকের উৎসব যে তারই জন্য।

নাইট ক্লাব আলো ঝলমল আর জনমুখর থাকলেও রাতের প্রহর বেড়ে এসেছে জলস্রোতের মত বাধাহীনভাবে। রাজপথ নীরব হয়ে আসছে ক্রমান্বয়ে। যানবাহন চলাচলও বন্ধ হয়ে এসেছে প্রায়।

গ্রীণ হাউস নাইট ক্লাবে তখন পুরোদমে চলেছে আমোদ-প্রমোদ, হাসি-গান আর পানীয় পান।

বয়গণ প্রত্যেকটা টেবিলে বিলেতী মদের বোতল আর কাচপাত্র পরিবেশন করে গেলো। খাবার পর পানীয় পান না করলে মূল্যবান খাবারগুলো হজম হয় না নাকি। গ্রীণ হাউসের এটা রেওয়াজ।

সমীরের পাশে নূরী এতোক্ষণ সব দেখছিলো। তার খাওয়াও শেষ হয়ে গিয়েছিলো, বয়টা এবার টেবিলে বোতল আর কাচপাত্র রেখে গেলে সে সমীরের দিকে চাইলো।

সমীর ইংগিতে তাকে চুপ থাকতে বললো, আলগোছে মদের বোতল আর গেলাসটা সরিয়ে রাখলো দূরে। নূরী বললো—কই, আহাদ ভাইয়া তো এলো না?

সমীর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো—আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে রওয়ানা দেবো।

বললো নূরী—তাই চলুন মিঃ সমীরবাবু, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

হ্যাঁ, রাত বারোটার বেশি হয়ে গেছে, ঘুম পাবারই কথা।

নূরী হাই তুলছিলো।

অন্যান্য টেবিলে তখন কাচপাত্রের টুং টাং শব্দ আর নারী-পুরুষ কণ্ঠের হাস্যধ্বনি ডায়াসের অর্কেষ্ট্রার সুরের সঙ্গে মিশে পরিবেশটা মোহগ্রস্ত করে তুলছিলো।

নূরী নিদ্রালস চোখ দু'টি মেলে তাকিয়ে আছে। ওর মনে হচ্ছিলো, টেবিলখানায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু এতোগুলো লোকের সম্মুখে এভাবে ঘুমানো কি সম্ভব হবে! তাছাড়া সমীরবাবুই বা ভাববেন কি। নূরী অতি কষ্টে বসে ছিলো নিশ্চুপ হয়ে।

এমন সময় হঠাৎ আলো নিভে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র নারীকণ্ঠের আর্তনাদ জেগে উঠলো ক্লাব-কক্ষের জমাট অন্ধকারের মধ্যে। পরক্ষণেই সব চুপ,একটুও শব্দ নেই।

গভীর একটা আতঙ্কের ছায়া যেন ক্লাব-কক্ষটার টুটি চেপে ধরলো লৌহ সাঁড়াশী দিয়ে। আলো জ্বলে উঠলো, পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেলো সচ্ছভাবে আবার, কিন্তু সকলের মুখের হাসি কোথায় যেন তলিয়ে গেছে। ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে সবার মুখ। একটু পূর্বেই যে ক্লাব-কক্ষ হাস্যমুখর উচ্ছল ছিলো এক নিমিষে কে যেন সবার মুখে কালির প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে।

কিসের আর্তনাদ?

সকলের মনেই ঐ এক প্রশ্ন, ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে এ-ওর মুখে, কথা বলবার সাহস হচ্ছে না যেন কারো।

যে যার টেবিলে বসেছিলো তেমনই আছে—কই, কারো মুখে তেমন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটনার ছাপ ফুটে উঠেনি। তবে যে আর্তনাদ শোনা গেলো সেটা কার কণ্ঠ দিয়ে বের হয়েছিলো? হঠাৎ চমকে উঠলো অনেকে, মিসেস শোহেলী কোথায়? যে স্থানে মিসেস শোহেলী দাঁড়িয়ে ছিলো সেই স্থানের মেঝেতে খানিকটা তাজা রক্ত পড়ে আছে।

ক্লাব-কক্ষ মধ্যে একটা ভীতিকর গুঞ্জনধ্বনি জেগে উঠলো, মরার মত ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে ছাই বর্ণ হয়ে উঠলো সকলের মুখ। একটু পূর্বে যে ক্লাব-কক্ষ নারী-পুরুষের হাসি-গানে মুখর ছিলো এক্ষণে সে কক্ষ যেন এক ভয়ঙ্কর শ্মশানের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াসে অর্কেষ্ট্রা থেমে গিয়েছিলো, আলো জ্বলে উঠার পর আবার সবেমাত্র বাজতে শুরু করেছে তখনই মিসেস শোহেলীর অন্তর্ধান-সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো ক্লাব-কক্ষ মধ্যে।

আবার ডায়াসে অর্কেষ্ট্রা থেমে গেলো, এবার একেবারে থেমে গেলো গোটারাতের জন্য। বাদ্যকরগণও উদ্বিগ্ন হয়ে ডায়াস থেকে নেমে এসেছে।

হঠাৎ একটা থমথমে ভাব গ্রীণ হাউসের সবুজ আলোকরশ্মিকে কালো করে তুললো যেন। একি অদ্ভুত কান্ড—মিসেস শোহেলীকে হত্যা করলো কে এবং কেই বা তাকে উধাও করলো? সকলের মনেই এই প্রশ্ন।

এমন ক্ষণে একখানা কাগজের টুকরা দৃষ্টিগোচর হলো, রক্তের পাশেই পড়ে আছে কাগজের টুকরাটা। এতোক্ষণ সবাই মিসেস শোহেলীর খুন ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কাগজের টুকরার দিকে কেউ লক্ষ্য করেনি।

একজন কাগজের টুকরাটা হাতে নিতেই ক্লাবের ম্যানেজার এগিয়ে এলেন। তিনি টুকরাটা হাতে নিয়ে আঁতকে উঠলেন ভীষণভাবে, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—দস্যু বনহুর! দস্যু বনহুর তাহলে মিসেস শোহেলীকে খুন করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রীণ হাউস নাইট ক্লাব মধ্যে বাজ পড়লো যেন। সবাই ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, দস্যু বনহুর তবে মিসেস শোহেলীকে হত্যা করে তাকে নিয়ে উধাও হয়েছে?

সমীরের পাশে নূরীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো, সমীর আর নূরী টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বিদায় হবার সুযোগ খুঁজছিলো কিন্তু হঠাৎ চলে যাবার উপায় ছিলো না তাদের। কারণ এই মুহূর্তে ক্লাব থেকে কাউকে বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছিলো না।

ম্যানেজার গম্ভীর মুখে মিসেস শোহেলীর রক্তের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যথা-ভরা কণ্ঠে বললেন—আজকের এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার জন্য আমি যারপর নেই দুঃখিত।

দস্যু বনহুরই যে মিসেস শোহেলীকে হত্যা করেছে এই কাগজের টুকরাখানাই তার প্রমাণ।

কক্ষমধ্যে কারো মুখে কোনো কথা নেই। পাথরের মূর্তির মত সবাই থ' বনে গেছে। কারো নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বুঝা যাচ্ছে না।

ম্যানেজার রুমালে চোখ দুটো মুছে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললেন—দুর্ধর্ষ দস্যু একটি সুন্দর ফুলের মত জীবন-প্রদীপ চিরতরে নিভিয়ে দিলো। আপনারা অনেকেই জানেন না বা বুঝতে পারেননি, কেন দস্যু বনহুর মিসেস শোহেলীকে হত্যা করেছে। লক্ষ্য করেছেন, মিসেস শোহেলীর হাতে একটি ভ্যানিটি ছিলো এবং সেই ভ্যানিটিতে ছিলো একটি বহু মূল্যবান পাথর। ঐ পাথরটাই হলো দস্যু বনহুরের লক্ষ্য, এবং এই পাথরের লোভেই মিসেস শোহেলীকে হত্যা করে তাকে নিয়ে উধাও হয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস, দস্যু বনহুর শোহেলীর লাশ নিয়ে যাবে না, লাশ আমরা পাবো বা পেতে পারি, কারণ ভ্যানিটিটা তাড়াহুড়া করে নিতে না পারায় সে লাশসহ উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের লোক মিসেস শোহেলীর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে। পুলিশ অফিসেও ফোন করা হয়েছে, এক্ষুণি পুলিশ ফোর্স ছুটে আসবে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে।

এতোগুলো কথা একসঙ্গে বলে থামলেন ম্যানেজার পারভেজ সাহেব।

পুনরায় বলতে শুরু করলেন—আপনারা দয়া করে বসে পড়ুন, যতক্ষণ না পুলিশ ফোর্স আসছে ততক্ষণ কেউ ক্লাবের বাইরে যাবেন না।

সবাই চলে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছেন, এমন সময় ম্যানেজারের উক্তি শ্রবণে হতাশ হয়ে পড়লেন সকলে।

ঐ মুহূর্তে একজন লোক ক্লবের মধ্য হতে বেরিয়ে এলো এবং ম্যানেজারের কানে মুখ নিয়ে কিছু বললো।

ম্যানেজার এবার বললেন—মিসেস শোহেলীর লাশ পাওয়া গেছে। তবে দস্যু বনহুরের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, সে পালাতে সক্ষম হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। পুলিশ ফোর্স এসে পড়লে আপনাদের চলে যাওয়া সহজ হবে না, কাজেই আপনারা এই মুহূর্তে যেতে পারেন......

ম্যানেজারের উক্তি শেষ হতে না হতে নাইট ক্লাবের আমন্ত্রিত অতিথিগণের মধ্যে সাড়া পড়ে গেলো, সবাই ক্লাব থেকে দ্রুত বিদায় হবার জন্য হুলস্থুল বাঁধালো। জলস্রোতের মত বেরিয়ে এলো সবাই ক্লাব-কক্ষ থেকে।

সমীর আর নূরীও বেরিয়ে যাচ্ছিলো এমন সময় পাঠান ড্রাইভার তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়—বাবুজী, আপলোগ ক্লাব মে রহিয়ে, বড়া সাহাব আয়েঙ্গে তব একসাথ যায়েঙ্গে আপলোগ.......

সমীর নূরীকে বললো—কি করবে এখন বলো? শুনলে তো ড্রাইভারের কথা?

আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে। বললো নূরী।

দস্যু বনহুরের ভয়?

হ্যাঁ।

মিছে নয়, আবার কার উপর হামলা করে বসে কে জানে! কথাটা বলে সমীর ভয়াতুর চোখে চারিদিকে তাকালো।

নূরী বললো—বড় সাহেব যখন বলেছে তখন বসতেই হবে।

অগত্যা সমীর নূরীসহ পুনরায় আসন গ্রহণ করলো।

নূরীর চোখের নিদ্রা ছুটে গিয়েছিলো, কি যেন গভীরভাবে ভাবছে সে বসে বসে।

সমীর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে মিঃ আহাদের, কখন আসবে সে।

ক্লাব-কক্ষের বড় ঘড়িটা রাত একটা ঘোষণা করলো।

ক্লাব-কক্ষ প্রায় সম্পূর্ণ নীরব, কয়েকজন বয়, বাবুর্চি আর আর্দালী এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছে ব্যস্তভাবে। মিসেস শোহেলী যে তাদের এ ব্যস্ততার কারণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

❑

হঠাৎ ছিদ্রপথ জমাট অন্ধকারে ভরে গেলো। মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজ, ওসিদ্বয় ও পাঠান ড্রাইভারের চোখের সামনে অন্ধকারের ফুলঝুরি ঝরে পড়লো যেন। সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের একটা তীব্র আর্তনাদ জেগে উঠলো গ্রীণ হাউসের অন্ধকারময় অভ্যন্তরের স্তরে স্তরে। মর্মস্পর্শী করুণ সে আর্তচিৎকার।

চমকে উঠলেন কুঠির মধ্যে মিঃ আহাদ ও তার সঙ্গিগণ।

পরক্ষণেই দেয়ালে আলোর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন জ্বলজ্বল করে। মিঃ আহাদ ও তার সাথিগণ চোখ রাখলেন আলোর ছিদ্রপথে।

এতোক্ষণ ক্লাবের মধ্য হতে যে একটা আনন্দমুখর প্রতিধ্বনির ক্ষীণ আভাস ভেসে আসছিলো, এই দন্ডে তার কিছুমাত্র শোনা গেলো না। সমস্ত ক্লাবটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে বাজ-পড়া পোড়া বাড়িটার মত।

ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হলেন মিঃ আহাদ ও তাঁর সহচরগণ। তাঁরা দেখতে পেলেন, একটা ভীষণ চেহারার লোক, যাকে কিছু পূর্বে আলখেল্লাধারী ইংগিত করেছিলো, সেই বলিষ্ঠ লোকটা একটি নিহত

নারীদেহ কাঁধে করে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো। নিহত নারীদেহ থেকে তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে। নারীটির সমস্ত শরীরে লাল পরিচ্ছদ থাকায় তার দেহের রক্ত বসনে বুঝা যাচ্ছিলো না। লোকটার হাত এবং কাঁধ বেয়ে যে রক্ত পড়ছিলো সেই রক্তই দেখতে পেলেন মিঃ আহাদ ও তাঁর সাথিগণ।

আলখেল্লাধারী উঠে দাঁড়ালো, জমকালো মুখোসের মধ্যে চোখ দুটো যেন জ্বলছে। আলখেল্লাধারীর ইংগিতে লোকটা নিহত নারী-দেহটাকে শুইয়ে দিলো ওদিকের লম্বা একটা টেবিলের উপর।

চমকে উঠলো পাঠান ড্রাইভার।

মিঃ আহাদ ও মিঃ হাফিজও চমকে উঠলেন ভীষণভাবে, এ যে মিসেস শোহেলীর মৃতদেহ! সর্বনাশ, আজকের উৎসব যে তার এবং মিঃ নিজাম হোসেনের বিবাহ দিন স্মরণেই উদযাপিত হচ্ছিলো—আজকের এই শুভদিনে মিসেস শোহেলীর এ অবস্থা হলো! মনে মনে ভাবলেন মিঃ আহাদ।

কারোমুখে কোনো কথা নেই, রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখছেন তাঁরা। মিসেস শোহেলীকে একটা টেবিলে লম্বা করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বুকের কাছে লাল শাড়িখানা রক্তের লাল ছোপে ভিজে কালো হয়ে উঠেছে, লালে লাল মিশে কালোই হয়। মিসেস শোহেলীর রক্তশূন্য পাংশু মুখখানা কাৎ হয়ে আছে এদিকে। চোখ দুটো অর্ধনির্মীলিত, এখনও চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু চকচক করছে। সরু ঠোঁট দু'খানা থেকে লিপষ্টিকের লাল রং মুছে যায়নি, কেমন যেন একটা বেদনা-ভরা ম্লান হাসির আভাস লেগে আছে এখনও ওর ঠোঁটের কোণে।

আলখেল্লাধারী টাকার ফাইলগুলো কালো পাথরের টেবিলের ড্রয়ারে খুলে উঠিয়ে রাখলো, তারপর উঠে দাঁড়ালো সে। মিসেস শোহেলীর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো। আলখেল্লার ভিতর থেকে একখানা হাত বেরিয়ে এলো, মৃত শোহেলীর চিবুক ধরে এপাশ ওপাশ নাড়া দিয়ে ছেড়ে দিলো মুখখানা।

গড়িয়ে পড়া বলের মত মাথাটা মৃদু ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে গেলো। সুন্দর মুখখানা মৃত্যুর হিমশীতল পরশেও ম্লান হয়নি এতোটুকু। ঠিক যেন ঘুমিয়ে আছে মিসেস শোহেলী! সুডৌল হাত দু'খানা ঝুলছে টেবিলটার দু'পাশে।

একটু পূর্বেই গ্রীণ হাউস নাইট ক্লাবের নারী-পুরুষের একমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণীয় বস্তু ছিলো সে। আজ তার গোলাপী দেহে রক্তাভ-আবরণ

অত্যধিক সুন্দর মানিয়েছিলো। কিছুক্ষণ পূর্বেও সে ঐ মুখখানা বিস্ফারিত করে কথা বলেছে, হেসেছে, ঐ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছে গ্রীণ হাউসের অপরূপ রূপ। নাসিকা দিয়ে গ্রহণ করেছে নাইট ক্লাবের নারী-পুরুষ দেহের মূল্যবান প্রসাধনের উগ্র গন্ধ। আর এক্ষণে শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন, হিমশীতল জড়পদার্থ সে। চেতনা নেই, নেই কোনো ভাবের উন্মেষ, নেই কোনো উপলব্ধিবোধ।

আলখেল্লাধারীর ইংগিতে একজন এ্যাপ্রন-পরা লোক একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছুরি নিয়ে মিসেস শোহেলীর মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়ালো।

যদিও মিসেস শোহেলীর প্রাণহীন অসাড় দেহটার পাশে সূতীক্ষ্ণ ধার ছুরি হস্তে লোকটা এগিয়ে এলো তবু কেন যেন আড়ালে দাঁড়িয়ে শিউরে উঠলেন মিঃ আহাদ এবং তাঁর সঙ্গিগণ।

একজন লোক মিসেস শোহেলীর প্রাণহীন দেহটার বুক থেকে পেট অবধি কাপড় সরিয়ে ফেললো। জামাটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললো দ্রুতহস্তে।

এবার ছোরাহস্তে এ্যাপ্রন-পরা লোকটা মিসেস শোহেলীর দেহটার উপর ঝুঁকে ছুরি দিয়ে বুক থেকে পেট অবধি চিরচির করে ছিঁড়ে ফেললো। রক্ত বেরিয়ে এলো কিন্তু অতি সামান্য গড়িয়ে পড়লো চারিপাশে।

ছুরিহস্তে লোকটা অত্যন্ত দ্রুত কাজ করছিলো। আলখেল্লাধারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো তীক্ষ্ণ নজরে। পাশেই দেওজী দাঁড়িয়ে, সেও নিপুণভাবে লক্ষ্য করছে সব। কিছু পূর্বে যে দু'টি লোকের গলার মধ্যে রবারের পাইপ ঢুকিয়ে সোনার খন্ডগুলি উঠানো হয়েছে, তারাও বসে আছে ওপাশের দুটো চেয়ারে। চুপচাপ কতকটা নিরীহ বনমানুষের মত।

কক্ষমধ্যে মেশিনগুলো পূর্বের মতই চালু করা আছে। নানারকম যন্ত্রপাতি স্তরে স্তরে সাজানো কক্ষটার চারপাশে। এক-পাশের টেবিলে বড়-ছোট নানা আকারের শিশিতে তরল পদার্থ, একটা কাঁচের জার থেকে মৃদু মৃদু ধূম্রকুন্ডলী ঘুর-পাক খেয়ে খেয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো। মনে হচ্ছে, কক্ষটা কোনো বৈজ্ঞানিকের লেব্রটরী।

যে টেবিলটায় মিসেস শোহেলীর মৃতদেহের উপর অস্ত্রোপচার চলছে সে টেবিলখানা সরু এবং লম্বাটে। এতো সরু যে মিসেস শোহেলীর হাত দু'খানা দু'পাশে ঝুলছিলো।

এ্যাপ্রন-পরা লোকটা মিসেস শোহেলীর বুক এবং পেটের ভিতরটা পরিষ্কার করে নিলো লম্বা একটা যন্ত্র দ্বারা।

মিসেস শোহেলীর বুক এবং পেটের চামড়া টেবিলের দু'পাশে ক্লিপের সাহায্যে ফাঁক করে রাখা হয়েছিলো।

মিঃ আহাদ ছিদ্রপথ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

ওসিদ্বয় আর দেখতে পারলেন না, তাঁদের পা দু'খানা যেন অবশ হয়ে আসছে। বসে পড়লেন ভূতলে, দু'খানে মাথাটা চেপে ধরে রাখলেন হঠাৎ যেন অজ্ঞান হয়ে না পড়েন।

পাঠান ড্রাইভার পাথরের মূর্তির মত জমে গেছে যেন, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখছে ওদের কার্যকলাপ। মিসেস শোহেলীর বুক এবং পেটের ভিতরটা সাঁশ বের করা লাল তরমুজের খোসার মত লাগছিলো।

মিঃ আহাদ পুনরায় ছিদ্রপথে দৃষ্টি রাখলেন। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেলো সবার, তবু ধৈর্যসহকারে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন তাঁরা। কি ভয়ঙ্কর নৃশংস দৃশ্য! যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ দৃশ্য সহ্য করা কঠিন।

দু'জন লোক দুটো থলের মধ্যে কিছু ভারী জিনিস নিয়ে এগিয়ে এলো মিসেস শোহেলীর শায়িত মৃতদেহের পাশে।

এ্যাপ্রন-পরা লোকটা প্রথম ব্যক্তির হাত থেকে থলেটে নিয়ে কি যেন ঢেলে দিলো মিসেস শোহেলীর নাড়ীভূড়ি বের করা দেহের খোলসের মধ্যে। দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তের থলেটাও ঢেলে দিলো, আরও দু'ব্যাগ বস্তু ঢেলে দিতেই মিঃ আহাদ বুঝতে পারলেন, থলে এবং ব্যাগের বস্তুগুলি অন্যকিছু নয়—সোনার স্তর বা খন্ড।

এ্যাপ্রন-পরা লোকটা সোনার স্তরগুলি মিসেস শোহেলীর দেহের মধ্যে ভয়ে পুনরায় ক্ষিপ্রহস্তে সেলাই করে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক করে ফেললো। জামা-কাপড়টাও এমনিভাবে গুছিয়ে দিলো, কে বলবে মিসেস শোহেলীর উদরে কয়েক পাউন্ড সোনা আছে।

এতোক্ষণ নীরবে কাজ করলেও মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনা চলছিলো, কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না মিঃ আহাদ ও তাঁর সাথিগণ।

এবার আলখেল্লাধারী গম্ভীর কণ্ঠে বললো, স্পষ্ট শুনতে পেলেন মিঃ আহাদ ও সঙ্গিগণ। বললো—দেওজী, ভজুয়া আর রশিদের পেটে দু'পাউন্ড করে চার পাউন্ড রইলো আর লাশটার মধ্যে রইলো বিশ পাউন্ড।

দেওজী বললো—ইলিয়াস খবর নিয়ে আসার কথা ছিলো সে এখনও এসে পৌঁছালো না।

আলখেল্লাধারী বললো—কোনো কারণবশতঃ হয়তো সে আসতে পারেনি বা পথে কোনো এ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। কাজেই বিলম্ব করা আর মোটেই উচিত হবে না। হঠাৎ পুলিশের লোক জানাজানি হতে পারে। মিসেস শোহেলীর নিহত সংবাদ পুলিসে না জানিয়ে অতিথিদের সামনে ভুয়ো সংবাদ প্রচার করা হয়েছিলো। সদরঘাটে আমাদের নৌকা প্রতীক্ষা করছে। ভজুয়া, রশিদ, মঙ্গল আর রাজু লাশের বাক্স বয়ে নিয়ে যাবে। পথে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে বলবে, ডেলিভারী কেসে হসপিটালে মারা গেছে, তাই নৌকা করে দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—বাস্......

দেওজী বললো—আমাকে অতো করে শেখাতে হবে না রায়। আজ সাত বছর ধরে মাল-চালানি ব্যবসা করছি......

আলখেল্লাধারী আর দেওজী যখন গম্ভীর কণ্ঠে কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন এ্যাপ্রন-পরা লোকটার তদারকে চারজন লোক মিসেস শোহেলীর মৃতদেহটা একটা লম্বামত কাঠের বাক্সে ভরে পেরেক ঠুকে বাক্সের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছিলো। অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং দ্রুতহস্তে কাজ করছিলো তারা।

আর বিলম্ব নয়, পাঠান ড্রাইভার সহসা বেরিয়ে গেলো দ্রুত। পরক্ষণেই তীব্র হুইসেলধ্বনি শুনতে পেলেন মিঃ আহাদ এং পুলিশ অফিসারত্রয়।

সেকি তীব্র আর তীক্ষ্ণ হুইসেল ধ্বনি।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রীণ হাউস নাইট ক্লাবের চারপাশ থেকে অসংখ্য পুলিশবাহিনী জলস্রোতের মত ক্লাবের মধ্যে প্রবেশ করলো। প্রত্যেকের হস্তেই উদ্যত রাইফেল।

মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজ রিভলভার বাগিয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গ্রীণ হাউসের গুপ্ত কক্ষমধ্যে, যেখানে মিসেস শোহেলীর কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে আলখেল্লাধারী এবং তার সহকারী দেওজী আর তাদের অন্যান্য অনুচর। সোনা চোরাচালানি কাজে কর্মরত কয়েকজন কর্মচারীও রয়েছে সেই কক্ষমধ্যে।

মিঃ আহাদ আর মিঃ হাফিজ কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে রিভলভার উদ্যত করে ধরলেন—খবরদার, একচুল কেউ নড়বে না; তাহলেই মরবে।

আলখেল্লাধারী হাত তুলে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে দেওজী এবং কক্ষমধ্যে সবাই মাথার উপর হাত তুলতে বাধ্য হলো।

মিসেস শোহেলীর কফিনের মুখ তখনও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয়নি, অর্ধখোলা অবস্থায় রয়েছে!

ওদিকে পাঠান ড্রাইভারের হুইসেলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উদ্যত রাইফেল হস্তে তীব্রবেগে নাইট ক্লাবের মধ্যে প্রবেশ করলো।

পাঠান ড্রাইভারের ইংগিতে নাইট ক্লাবের প্রত্যেকটা বয়-বাবুর্চী এবং ম্যানেজার ও তার সহকারিগণকে বন্দী করা হলো। এদিকে এদের বন্দী করার নির্দেশ দিয়েই পাঠান ড্রাইভার কতকগুলো পুলিশ ফোর্স নিয়ে সোনা চোরাচালানি কক্ষে প্রবেশ করলো।

ঠিক সেইমুহূর্তে আলখেল্লাধারী হঠাৎ কক্ষমধ্যস্থ গোল কালো পাথরের টেবিলটার উপরে উঠে দাঁড়ালো, নিমিষে টেবিলখানা নিচে সাঁ সাঁ করে দেবে যাচ্ছে দেখতে পেলেন তাঁরা। মিঃ আহাদ আলখেল্লাধারীকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লেন। একটা অট্টহাসির শব্দ শোনা গেলো।

পাঠান ড্রাইভার এক সেকেন্ড বিলম্ব না করে সেও লাফিয়ে নেমে পড়লো জমকালো টেবিলখানার উপরে। টেবিলখানা তখন মেঝে থেকে কয়েক গজ নিচে নেমে গেছে। নিমিষে মেঝেটা পূর্বের মত সমতল হয়ে পড়লো, এতোটুকু ফাঁক বা চিহ্ন কোথাও রইলো না।

আলখেল্লাধারী আর পাঠান ড্রাইভার যেন হাওয়ায় মিলে গেলো।

মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজ পুলিশকে আদেশ দিলেন, দেওজী এবং অন্যান্যকে বন্দী করে ফেলতে।

পুলিশবাহিনী প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো। মিঃ হাফিজ স্বয়ং দেওজীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

ওদিকে পাথরের টেবিলখানা গভীর মাটির তলায় লিফটের মত সাঁ সাঁ করে নিচে নেমে চলছে। টেবিলের উপর রীতিমত ধস্তাধস্তি চলছে পাঠান ড্রাইভার আর আলখেল্লাধারীর।

পাঠান ড্রাইভার রিভলভার থেকে গুলী নিক্ষেপ করলে আলখেল্লাধারী দাঁতে দাঁত পিষে বলছিলো—ছাতুখোর তুমি আমাকে গুলী বিদ্ধ করে হত্যা করবে? হাঃ হাঃ হাঃ আমার আলখেল্লা ভেদ করা কোনো আগ্নেয় অস্ত্রের সাধ্য নয়।

পাঠান ড্রাইভার চমকে উঠলো, কিন্তু কোনো জবাব দিলো না। নিজের রিভালভারখানা দূরে ফেলে দিলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে আলখেল্লাধারী তার আলখেল্লার মধ্যে হতে একটা অটোম্যাটিক ল্যুগার পিস্তল বের করে উদ্যত করে ধরলো পাঠান ড্রাইভারের বুক লক্ষ্য করে।

পাঠান ড্রাইভারের কাছ থেকে মাত্র দু'হাত দূরে আলখেল্লাধারীর পিস্তলসহ হাতখানা। পাঠান ড্রাইভার মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে পাথরের টেবিল লিফট্ খানা থেমে গেছে।

আলখেল্লাধারী অটোম্যাটিক ল্যুগার পিস্তল পাঠান ড্রাইভারের বুক লক্ষ্য করে রেখে যেমন লিফট থেকে নামতে গেলো অমনি পাঠান ড্রাইভার পা দিয়ে প্রচন্ড এক লাথি মারলো আলখেল্লাধারীর দক্ষিণ হস্তে।

সঙ্গে সঙ্গে আলখেল্লাধারীর হস্তস্থিত পিস্তলখানা ছিটকে পড়লো কয়েকহাত দূরে। পাঠান ড্রাইভার মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো আলখেল্লাধারীর উপর।

উভয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে।

চললো ধস্তাধস্তি।

কক্ষটা যে গভীর মাটির তলায় তা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। এ কক্ষটার মধ্যে কোনো মেশিন বা যন্ত্রপাতি নেই কিন্তু কক্ষমধ্যে রয়েছে নানা জাতীয় কাঠের বাক্স। বাক্সগুলো স্তরে স্তরে সাজানো। কক্ষের দেয়ালে কয়েকটা পাওয়ারফুল বাল্ব জ্বলছে।

আলখেল্লাধারী কিছুতেই পাঠান ড্রাইভারের সঙ্গে পেরে উঠছিলো না, হঠাৎ কৌশলে একবার ছাড়া পেয়ে দ্রুত দেয়ালের দিকে চলে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে একটা বোতামের সুইচ টিপে দিলো সে ক্ষিপ্রহস্তে।

অমনি পাঠান ড্রাইভারের দু'পাশের দেয়াল দ্রুতগতিতে সরে আসছে দু'পাশ থেকে। আর মুহূর্ত বিলম্ব হলে পিষে যাবে পাঠান ড্রাইভার। এক লাফে সে আলখেল্লাধারীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

তখনও আলখেল্লাধারী সুইচটায় চাপ দিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়াল দুটো এসে প্রচন্ড ধাক্কা খেলো একখানা আর একখানা দেয়ালের গায়ে। শিউরে উঠলো পাঠান ড্রাইভার —এতোক্ষণ তার অবস্থা থেতলে যাওয়া ছোব্ড়ার মতই হতো। দেয়াল দুটো আসলে সিমেন্ট বা পাথরে তৈরি নয়। লৌহপাত বা ষ্টিলের তৈরি ভারী দেয়াল দু'খানা। আলখেল্লাধারী কৌশলে হত্যা করতে চেয়েছিলো পাঠান ড্রাইভারকে তারপর পালিয়ে যাবে ভেবেছিলো সে নির্বিঘ্নে।

কিন্তু পাঠান ড্রাইভার আলখেল্লাধারীর হাত ধরে ভীষণ জোরে টান দিলো।

সুইচ থেকে হাত সরে যেতেই সাঁ করে দু'পাশে দু'খানা দেয়াল ফাঁক হয়ে পূর্বের আকার ধারণ করলো।

আবার শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

ক্রমান্বয়ে আলখেল্লাধারী যেন শিথিল হয়ে আসছে। কিছুতেই পেরে উঠছে না সে পাঠান ড্রাইভারের সঙ্গে। রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছে আলখেল্লাধারী।

পাঠান ড্রাইভার এবার আলখেল্লাটা চেপে ধরলো তারপর টেনে নিয়ে এলো ওদিকের সেই পাথর-তৈরি লিফটখানার উপর। পাথরের টেবিল আকারে লিফট্-আশ্চর্যই বটে! হঠাৎ পাঠান ড্রাইভারের নজরে পড়লো টেবিলের মাঝখানে কালো দুটো বোতাম। পাঠান ড্রাইভার একটিতে পা দিয়ে চাপ দিলো কিন্তু একটুও নড়লো না পাথরের টেবিলখানা।

আলখেল্লাধারী পাথরের টেবিলখানা থেকে লাফিয়ে পড়ার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না, পাঠান ড্রাইভারের বলিষ্ঠ হাতের মুঠি থেকে কিছুতেই নিজকে ছাড়িয়ে নিতে পারছে না যেন আর সে।

পাঠান ড্রাইভার দ্বিতীয় বোতামে পা দিয়ে চাপ দিতেই অবাক হলো সে। পাথরের টেবিল লিফট্খানা যেন হাওয়ার বেগে উপরে উঠতে লাগলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড পাঠান ড্রাইভার দেখলো পুনরায় তারা ফিরে এসেছে গ্রীণ হাউস নাইট ক্লাবের গুপ্তকক্ষে। অবাক হয়ে দেখলো, মিঃ আহাদ, মিঃ হাফিজ অন্যান্য শয়তানকে বন্দী করে ফেলেছেন।

দেওজীর বুকে রিভলভার চেপে ধরে আছেন মিঃ আহাদ হয়তো তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিলো, ভূগর্ভে প্রবেশের কোনো উপায় আছে কিনা পাঠান ড্রাইভারের জন্য তাঁরা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন রীতিমত।

সহসা পাঠান ড্রাইভার আর আলখেল্লাধারীকে যাদুমন্ত্রের আবির্ভাবের মত দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন।

পাঠান ড্রাইভার আলখেল্লাধারীর ঘাড়ের কাছের আলখেল্লা চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিলো।

টেবিল লিফ্টখানা স্থির হতেই আলখেল্লাধারীকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে নিজেও নেমে দাঁড়ালো পাঠান ড্রাইভার। কক্ষমধ্যে সকলের চোখেমুখেই রাজ্যের বিস্ময়।

মিঃ আহাদ দ্রুত এগিয়ে এসে আলখেল্লাধারীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন এবং পাঠান ড্রাইভারের পিট চাপড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

ক্ষণিকের জন্য সবাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, পাঠান ড্রাইভারের বুদ্ধি-কৌশলে শুধু বিস্মিতই নন, হতভম্ব তাঁরা। ঠিক ঐ মুহূর্তে আলখেল্লাধারী দ্রুত ওপাশের একটা চক্রাকারে মেশিনের উপর পা দিতে যাচ্ছিলো।

ধরে ফেললো পাঠান ড্রাইভার খপ্ করে।

আর এগুতে পারলো না আলখেল্লাধারী।

আলখেল্লাধারী চক্রাকারের যে মেশিনটার উপর পা দিয়ে চাপ দিতে যাচ্ছিলো সেটা একটা সাংঘাতিক বোম। ইলেকট্রিক সংযোগ করা এই চক্রটার সঙ্গেই ফিট করা আছে বোমটা। চক্রাকার যন্ত্রটায় চাপ দিলেই বোমা বিস্ফারিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীণ হাউস নাইট ক্লাব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। কিন্তু সে সুযোগ আর পেলো না আলখেল্লাধারী।

পাঠান ড্রাইভার এবার একটানে খুলে ফেললো আলখেল্লাধারীর মুখের আবরণটা। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষমধ্যে সবাই একটা বিস্ময়কর শব্দ করে উঠলো। মিঃ আহাদ অত্যধিক অবাক কণ্ঠে বললেন— জনাব নিজাম হোসেন, আপনি!

ইন্সপেক্টার মিঃ হাফিজ বলে উঠেন—আপনিই এই সোনা চোরা চালানির অধিনায়ক? আশ্চর্য!

কক্ষমধ্যে তার অনুচরগণও অবাক হয়ে গেছে, তারাও জানে না এই আলখেল্লার নিচে তাদের যে অধিনায়ক আছে কে সে? কি তার পরিচয়? একজন সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ যে তাদের অধিনায়ক এটা তারা কেউ জানতো না। সবাই জানতো গ্রীণ হাউসের একজন প্রধান অতিথি জনাব নিজাম হোসেন।

শুধু অবাক হয়নি জনাব নিজাম হোসেন ওরফে রায় বাহাদুর শ্যামকান্তের প্রধান সহচর বা পার্টনার দেওজী সিং।

পাঠান ড্রাইভার এতোক্ষণে বুঝতে পারলো, আলখেল্লাধারী কেন তার সঙ্গে পেরে উঠছিলো না, বুদ্ধি-কৌশল-শক্তি দিয়ে পাঠান ড্রাইভারকে কাবু করতে চেয়েছিলো কিন্তু পাঠান ড্রাইভারের দেহের শক্তির কাছে কাবু হয়ে পড়েছিলো সে অল্পক্ষণেই।

মিঃ আহাদ বললেন—আশ্চর্য অধিনায়ক আপনি মিঃ নিজাম হোসেন। নিজের স্ত্রীর দেহের খোলসে সোনা চালান করে পৃথিবীতে স্বনামধন্য সোনা চোরাচালানি নামে খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিলেন? সে আশায় আপনার ছাই পড়েছে। পাষন্ড শয়তান, একটা নিষ্পাপ সুন্দর জীবনকে এভাবে ধ্বংস করতে এতোটুকু মায়া হলো না? পুলিশবাহিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন—শুধু হাতে হাতকড়া লাগিয়ে নয়, প্রকাশ্য রাজপথে হাতে-পায়ে বেড়ী লাগিয়ে হাটিয়ে নিয়ে যাবে। বুকের সঙ্গে বেঁধে দেবে সাইন বোর্ড, তাতে লিখে দেবো—বিশ্বের প্রখ্যাত সোনা চোরাচালানি। এভাবে পুলিশ ফোর্স পরিবেষ্টিত অবস্থায় পুলিশ অফিসে নিয়ে যাবে। তারপর বিচার হবে।

ততক্ষণে সমীর আর নূরীও এসে পড়েছে পুলিশবাহিনীর সঙ্গে সেই গুপ্ত রহস্যময় কক্ষে।

সমীর আর নূরী যেন এসব দেখে হাবা বনে গেছে। একটু পূর্বে যে মিসেস শোহেলীকে তারা হেসে হেসে কথা বলতে দেখেছে এই দন্ডে তাকে মৃত অবস্থায় কফিনের মধ্যে শায়িত দেখছে। কফিনের মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করা না হওয়ায় মিসেস শোহেলীর ফ্যাকাশে মুখখানার কিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো তারা কফিনটার ফাঁকে।

পাঠান ড্রাইভার তখন বলে আসার পর নূরী আর সমীর এক পাশে বসেছিলো চুপচাপ, বড় সাহেব কখন আসবেন সেই আশায়, বড় সাহেব ও আসেন না, তাদের যাওয়াও আর হয় না।

এতো কান্ডের মধ্যে বসে বসে দয়াময়ের নাম স্মরণ করছিলো সমীর আর নূরী, এমন সময় হুইসেলধ্বনি শুনতে পায় তারা। অনেকগুলি পুলিশ দ্রুত প্রবেশ করতে থাকে নাইট ক্লাবের ভিতরে।

পুলিশ দেখে সমীরের বুকে সাহস এসেছিলো, সেও নূরীসহ পুলিশবাহিনীর সঙ্গে এসে পড়েছিলো এই গুপ্তকক্ষে। সমীর আর নূরী কম অবাক হয়নি— জনাব নিজাম হোসেনের হাতে এবং দেওজীর হাতে হাতকড়া দেখে বিস্মিত হয়েছিলো তারা। তবে ব্যাপারটা অল্পক্ষণেই বুঝে নিয়েছিলো ভালভাবে।

মিঃ হাফিজ এবার পাঠান ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন—মিঃ চৌধুরী, আজ এই বিরাট সাফল্যের মূলে আপনার ড্রাইভার হাসান। তাকে সরকার থেকে আমরা পুরস্কারের ব্যবস্থা করবো।

মিঃ আহাদ চৌধুরী শুধু হাসলেন।

পাঠান ড্রাইভার তখন হেসে এগিয়ে এলো, নিজের মাথার পাগড়ী খুলে ফেললো এবং মুখে ফ্রেঞ্চকাটা দাড়ি-গোঁফও খুলে ফেললো।

কক্ষস্থ সবাই চমকে উঠলো।

মিঃ হাফিজ বললেন—মিঃ আলম আপনি! আপনিই মিঃ চৌধুরীর পাঠান ড্রাইভার সেজে---বিস্ময়ে কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে এলো তাঁর।

সমীরের চোখেও রাজ্যের আনন্দদ্যুতি খেলে যায়, সকলের অলক্ষ্যে একবার আলম আর নূরীর দৃষ্টি বিনিময় হয়। দৃষ্টির মাধ্যমে নূরী অভিনন্দন জানায় পাঠান ড্রাইভারকে।

নূরী আর আলমের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস অন্য কেহ লক্ষ্য না করলেও মিঃ আহাদের চোখে চাপা রইলো না, তিনি সব দেখলেন।

মিঃ হাফিজ বললেন—মিঃ আলম, সত্যি আপনার বুদ্ধির অদ্ভুত ক্ষমতা আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করে দিয়েছে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার জন্যই আজ এতোবড় একটা ভয়ঙ্কর দুর্দান্ত সোনা চোরাচালানি দলকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হলাম।

মিঃ আলম বললেন—ইন্সপেক্টর এই বৃদ্ধ শয়তান নিজাম হোসেন শুধু সোনা চোরাচালানকারীই নয়, এর আসল নাম রায় বাহাদুর শ্যামকান্ত—একজন নাম করা খুনীও বটে। সে আজ নিজ স্ত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, এমনি আরও অনেক খুন সে করেছে—যা তার স্ত্রী মিসেস শোহেলী আমাকে জানিয়েছিলো ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে থাকাকালে। সেই থেকেই আমার সন্দেহ জেগেছিলো—ঐ হোটেলে থাকাকালীনই আমি তাকে ফলো করি এবং গোপন রহস্যের সন্ধান পাই। একদিন নয়, এমনি কত দিন আমি তাকে অনুসরণ করেছি। কোনোদিন তার ড্রাইভারের বেশে, কোনোদিন তার চাকর রমেশের বেশে আমি রায় বাহাদুরকে ফলো করেছি এবং কাজ এতোদূর এগুতে সক্ষম হয়েছি---

মিঃ আলম যখন কঠিন কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলো তখন মিঃ আহাদ তার সুন্দর তেজোদ্দীপ্ত মুখমন্ডলের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়েছিলেন।

মিঃ আহাদ মিঃ হাফিজ পুলিশ ফোর্সসহ সোনা চোরাচালানী দলকে যখন গ্রেফতার করে নিয়ে ফিরে চললেন তখন সকাল হয়ে গেছে।

মিঃ আলমের বুদ্ধি-কৌশলে উদ্ধার পেলো কোটি কোটি টাকার সোনা। আর ধ্বংস হলো এক দুর্ধর্ষ সোনা চোরাচালানী দল।

❑

তেজগাঁ বিমান বন্দর।

মিঃ আহাদ আর সমীর এসেছেন মিঃ আলম আর নূরীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।

প্লাটফরমে বোইং দাঁড়িয়ে, আকাশে উড়বার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যাত্রীগণ আত্মীয়-স্বজনের কাছ হতে বিদায় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্লেনের দিকে। বোইং ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে প্রায়।

মিঃ আলম আর নূরী প্লেনের দিকে এগিয়ে যাবার পূর্বে, নূরী মিঃ আহাদকে লক্ষ্য করে বললো—ভাইজান, এই নগণ্য বোনটিকে নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন?

শান্ত গলায় বললেন মিঃ আহাদ—নূরী, তোমার মত বোন পেয়ে হারালাম, সত্যি আমি এ জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি। তোমাকে না পেলে আজ হয়তো এতোদূর এগুতে সক্ষম হতাম না। চিরদিন তোমার কথা স্মরণ থাকবে।

নূরীর চোখ দুটো ছলছল করছিলো, আঁচলে চোখ মুছছিলো সে।

সমীরের তো কথাই নেই, সে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো—চলেই যদি যাবে তবে এতো মায়া বাড়িয়ে ছিলে কেন বলতো?

নূরী বলে—বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে সমীরবাবু।

মিঃ আলম হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে সমীরের পিঠে চাপড়ে বললো—গুড বাই সমীর বাবু। তারপর মিঃ আহাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো,তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে বললো—গুড বাই মিঃ চৌধুরী চিরদিন আপনার কথা স্মরণ থাকবে।

মিঃ আহাদের কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো অদ্ভুত এক সুর—বন্ধু, তোমাকেও আমি স্মরণ রাখবো, সবার চোখে ধূলো দিলেও আমার চোখে তুমি ধূলো দিতে পারোনি। তোমার মহান হৃদয়ের কাছে আমিও পরাজিত হয়েছি, তাই তোমার পরিচয় জেনেও আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম দস্যু বনহুর—বিদায় বন্ধু---

মিঃ আহাদ এমনভাবে কথাগুলো বললেন একমাত্র মিঃ আলম ছাড়া কেউ শুনতে পেলো না।

মিঃ আলমবেশী দস্যু বনহুর চমকালো না, হেসে পুনরায় করমর্দন করলো সে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ আহাদ চৌধুরীর, তারপর নূরীর হাত ধরে এগিয়ে গেলো সে বোইং-এর দিকে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে মিঃ আহাদ ও সমীরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো দস্যু বনহুর।

ফিরে এলো দস্যু বনহুর নূরীসহ তার নিজস্ব আস্তানায়। আবার আনন্দমুখর হয়ে উঠলো তার অনুচরগণ। সর্দারকে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হলো সবাই।

একটা বড়রকম উৎসবের আয়োজন করলো তারা সকলে মিলে। বনহুরের আস্তানায় এ উৎসব হবে। মহাসমারোহে উৎসবের আয়োজন চলতে লাগলো। দস্যু বনহুরের আস্তানায় আনন্দ উৎসব—কম কথা নয়।

ভূগর্ভ দরবার -কক্ষে বনহুর তার আসনে উপবিষ্ট।

অনুচরগণ সম্মুখে দন্ডায়মান।

রহমান বনহুরের আসনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

দরবার-কক্ষের চার কোণে চারটা মশাল দাউ দাউ করে জ্বলছে।

বনহুরের দেহে তার জমকালো ড্রেস। কোমরের বেল্টে রিভলভার। মশালের আলোতে চক্‌চক্ করছে তার জমকালো ড্রেসটা। মাথায় পাগড়ী। সম্পূর্ণ কালো ড্রেসের মধ্যে দীপ্ত সুন্দর বলিষ্ঠ একখানা মুখ। গভীর নীল দুটো চোখে আজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে না। ঠোঁট দু'খানায় ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠেনি, মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে দু'ঠোঁটের কোণে।

দরবার-কক্ষে আলোচনা চলছে।

বনহুর অনুপস্থিতকালে কি কি কাজ হয়েছে তারই হিসাব নিকাশ শুনছিলো সে। রহমানের পরিচালনায় তার আস্তানায় কোনো কাজ বাকি পড়ে নেই শুনে এবং দেখে আনন্দিত হলো বনহুর। খুশিমনে আনন্দ-উৎসব করার জন্যে আদেশ দিলো সে অনুচরদের মধ্যে।

দরবার-কক্ষ থেকে যখন বনহুর বেরিয়ে এলো তখন বৃদ্ধা দাইমা এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে।

রহমান বনহুরের পাশেই ছিলো, বললো—দাইমার একটা অনুযোগ আছে সর্দার।

বনহুর হেসে বললো—কেমন আছো দাইমা।

অত্যন্ত বৃদ্ধা হওয়ায় দাইমার কথাবার্তা বেশ জড়িত হয়ে পড়েছিলো, বললো—ভালই তো আছি। কিন্তু আমার কথা কি ভাবিস তুই?

কে বললো তোমার কথা ভাবি না দাইমা?

তবে আমার কাছে যাস না, বসিস না, কথা বলিস না?

সময় পাই না বলে এসব ভুল হয় আমার, বুঝলে দাইমা? চলো আজ তোমার সঙ্গে বসে অনেক গল্প করবো। রহমানের দিকে তাকিয়ে বললো—কই নাসরিনকে তো দেখছি না?

দাইমা ফোকলা মুখে একবার একরাশ হাসি টেনে বললো—সে খুব রেগে আছে তোর উপর।

কেন?

কতদিন পর আস্তানায় ফিরে এলি কারো সঙ্গে দেখাটি করলি না?

আজ কোথাও যাবো না দাইমা, তোমাদের নিয়েই কাটাবো। চলো দাইমা, আমরা সবাই মিলে তোমার ঘরে গিয়ে বসি। বনহুর আজ সত্যি ছোট্ট বালকের মত বৃদ্ধা দাইমাকে অনুসরণ করলো।

পাথরের তৈরি মাঝারি কুঠরী। দড়ির খাটিয়ায় শোয় বৃদ্ধা দাইমা। বনহুর আর দাইমা খাটিয়ায় বসে। রহমান চলে যায় নাসরিনের খোঁজে। একটু পরে ফিরে আসে নাসরিনকে নিয়ে।

বনহুর তাকায় রহমান আর নাসরিনের দিকে।

এখন নাসরিন রহমানের স্ত্রী।

বনহুর হেসে বলে—পালিয়ে বেড়াচ্ছো কেন নাসরিন?

কই না তো।

তবে যে বড় দেখলাম না তোমাকে এসে অবধি?

নাসরিন লজ্জায় মাথা নত করে দাঁড়ালো?

বনহুর বললো—বসো তোমরা, আজ তোমাদের সঙ্গে কাটাবো বনহুর কথার ফাঁকে খুঁজছিলো আর একজনকে —সে হলো নূরী।

নূরী কোথায় বলতে আজ বাধছিলো বনহুরের, বিশেষ করে রহমান আর দাইমার সামনে।

দাইমা বললো—বড্ড রোগা হয়ে গেছিস বনহুর।

দেহের দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর—কই, না তো?

দাইমার কথায় মায়ের মুখখানা খানিকের জন্য ভেসে উঠলো বনহুরের চোখের সম্মুখে—তার মাও এমনি করে বলেন যদিও তার স্বাস্থ্য পূর্বের চেয়ে এখন আরও অনেক ভাল হয়েছে।

বৃদ্ধা বনহুরের বুকে হাত বুলিয়ে বললো—নিজের চোখে নিজকে ভালই মনে হয়, বুঝলি? আমি ছোট থেকে মানুষ করেছি, আর আমি জানি না তোর শরীরের কথা? বনহুর।

বলো দাইমা?

একটা কথা তোকে অনেকদিন থেকে বলবো বলবো করে বলা হয়নি।

আজ বলো?

রাখবি তো বাবা আমার কথা?

কেন রাখবোনা দাইমা যা চাইবে তাই দেবো তোমাকে।

একটা ব্যথা-করুণ হাসির আভাস ফুটে উঠলো দাইমার ঠোঁটের কোণে, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললো—কিছু নেবার বয়স কি আর আমার আছে বাপ। এখন নিবি তোরা। আমি বলছিলাম কি বয়স হয়েছে, এবার বিয়ে থা করে সংসারী হও।

হাসলো বনহুর, তাকালো একবার রহমান ও নাসরিনের মুখের দিকে।

দাইমা অবশ্য ভুল বলেনি কিছু, কারণ বনহুরের সঙ্গে মনিরার বিয়ে হয়েছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। শুধু চৌধুরীবাড়ির কয়েকজন আর বনহুরের অনুচরদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচর ছাড়া কেউ জানে না এ বিয়ের কথা। বনহুর শুধু মনিরাকে বিয়েই করেনি, তাদের এক সন্তানও হয়েছে। তা'ছাড়াও নূরীর প্রেম, প্রীতি আর ভালোবাসা তাকে রেহাই দেয়নি। যতই বনহুর নূরীর কাছ থেকে নিজকে সংযত রেখেছে ততই একটা পবিত্র আকর্ষণ তাকে অহরহঃ হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, বনহুর উপেক্ষা করেছে সে আকর্ষণকে—মনকে শক্ত করে নিয়েছে কঠিনভাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার হয়েছে বনহুরের—নূরী জয়ী হয়েছে।

রহমান খোদাকে সাক্ষী রেখে নূরীকে তুলে দিয়েছিলো তার হাতে—লৌকিকতাপূর্ণ বিয়ে তার নূরীর সঙ্গেও হয়নি। বনহুর দাইমার কথায় দৃষ্টি নত করে নেয়, কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

রহমান বুঝতে পারে সর্দার বিব্রত বোধ করছে। তাই সে বলে—দাইমা, তুমি কি কোনো মেয়ে পছন্দ করে রেখেছো?

পছন্দ শুধু অমি করবো কেন, পছন্দ তোমরা সবাই করবে—নূরীকে আমি মানুষ করেছি ওর জন্যই তো।

আর একবার বনহুর আর রহমান দৃষ্টি বিনিময় হলো।

বললো রহমান—তুমি যদি ভালো মনে করো তবে তাই হবে।

না, আমি ওর মুখে শুনতে চাই। বল্ বনহুর তুইতো রাজি আছিস বাপ?

বনহুর একটু হেসে বলে—হাঁ রাজি।

আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর তবে?

বনহুর দাইমার হাতের উপর হাত রাখে।

দাইমা বনহুরের হাতখানা মুঠোয় চেপে ধরে বলে—সত্যি আমি কত খুশি হয়েছি আজ। জানিস, নূরী তোকে কত ভালবাসে। ছোটবেলা থেকেই সে তোকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছে। না না, পারবি না পারবি না ওকে গ্রহণ না করে।

এই কথা আদায় করার জন্য তুমি বুঝি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে দাইমা?

হাঁ বাপ, হাঁ। কবে মরে যাবো, বড় সখ তোর বিয়েটা দেখে যাবো।

তাহালে এখন উঠি কেমন? বনহুর দাইমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললো।

দাইমা বনহুরের একখানা হাত নাড়তে নাড়তে বললো—কত ছোট ছিলি—আজ কত বড় হয়েছিস! এই হাতখানা কত ক্ষুদে ছিলো, একদিন আমার হাতের মুঠায় মিশে থাকতো আর আজ আটে না। ভাল করে দেখতে পাই না তাই মন ভরে না তোকে দেখে। যা বাবা যা আজ আমি অনেক খুশি হয়েছি।

বনহুর দাইমার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে আসে নিজের বিশ্রাম কক্ষে।

এতোক্ষণ নূরীকে না দেখে অবাক হয় বনহুর।

তার বিশ্রামকক্ষেও নূরী নেই, তবে গেলো কোথায়!

আস্তানা থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যায় বনহুর ঝরণার ধারে। দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে বনভূমি আলোকিত। ঝরণার পাশে এসে দাঁড়ায় বনহুর, হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যায় ঝরণার জলে। বিস্মিত না হয়ে মুগ্ধ হয় বনহুর—পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণাটা নিচে নেমে এসেছে। তারপর ঠিক নদীর আকারে বয়ে গেছে বনভূমির মাঝখান দিয়ে। দু'পাশে বড় বড় বৃক্ষলতা গুল্ম মাঝখানে ঝরণা। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলোকরশ্মি ঝরণার জলে সোনালী সাপের মত খেলা করছে—তারই ফাঁকে সাঁতার কাটছে পাহাড়িয়া মেয়ে নূরী।

বনহুর তীরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক নয়নে।

আপন মনে সাঁতার কাটছে নূরী, কতকগুলি রাজহাঁস তার চারপাশে সাঁতার কাটছে—যেন ওরা খেলা করছে একসঙ্গে।

ঝরণার সচ্ছ সাবলীল জলধারায় নূরীর যৌবনভরা দেহখানা যেন অপূর্ব লাগছিলো।

হঠাৎ নূরীর দৃষ্টি চলে আসে বনহুরের দিকে।

লজ্জায় কুঁকড়ে যায় না নূরী বরং খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠে সে। দু'হাত প্রসারিত করে ডাকে—হুর, চলে এসো।

নূরীর আকুল আহ্বান বনহুরকে চঞ্চল করে তোলে গা থেকে জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝরণার বুকে। সাঁতার কেটে এগুতে থাকে নূরীর পাশে।

নূরী ডাকলো বটে কিন্তু সে তাকে ধরা দিতে রাজি নয়। বনহুর যতই এগোয় নূরী বিপরীত দিকে সাঁতার কেটে ততই সরে যায়। বনহুর ধরতে পারে না ওকে। নূরী জংলী পাহাড়ী মেয়ে—সাঁতারে সে দক্ষ। বনহুরও কম নয়, ছোট বেলায় ঝরণায় সাঁতার কাটা ছিলো তার নেশা। নূরী যতই দ্রুত সাঁতার কেটে বনহুরের কাছ থেকে দূরে সরে যাক কিন্তু পারে না, বনহুর ওকে ধরে ফেলে খপ করে।

হাঁসগুলো এতোক্ষণ আলগোছে নূরীর ঠিক পাশে পাশে সাঁতার কাটছিলো, এবার পাখা ঝাপটা দিয়ে সরে যায়।

বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলে।

নূরীর কোমল সিক্ত দেহখানা বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুর নিষ্পেষণে রাঙা হয়ে উঠে, বলে নূরী—আঃ বড্ড দুষ্ট তুমি।

বলো আর পালাবে?

উঁ হুঁ ছেড়ে দাও, আর পালাবো না।

রাজহাঁসগুলো আবার ঘিরে ধরে ওদের দু'জনাকে। বনহুর একটা রাজহাঁসের বাচ্চা নিয়ে নূরীর কাঁধে বসিয়ে দেয়—বাঃ চমৎকার লাগছে।

যাও! হাঁসের বাচ্চাটা বনহুরের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেয় নূরী।

বনহুর বলে—একটা জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।

জরুরি কথা?

হুঁ।

কোনো মন্দ কথা নয় তো? আশঙ্কাভরা কণ্ঠে বলে নূরী।

বনহুর আর নূরী তখন ঝরণার মধ্যে বুক অবধি জলে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো।

বনহুর তীরের দিকে এগুতে এগুতে বললো—বড্ড মন্দ কথা থাক, না শোনাই ভাল।

নূরী বনহুরের হাতখানা এঁটে ধরে—কি কথা বলো?

না বলবো না।

ছাড়বো না তোমাকে। বলো হুর? নূরী দু'হাতে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।

বনহুর নূরীর কপাল থেকে ভিজে চুলগুলো আংগুল দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বলে—দাইমার আদেশ, তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরে থাকতে হবে।

মুহূর্তে বিবর্ণ হয় নূরীর মুখমন্ডল—সে জানে, দাইমা তাদের আস্তানার একজন প্রবীণা। কারো কথা বনহুর না মানলেও দাইমার কথা সে সহসা উপেক্ষা করতো না কোনোদিন। দাইমাও তো বনহুরকে মানুষ করেছে মায়ের মত স্নেহ-আদর দিয়ে। নূরীর কথাটা বিশ্বাস হলো, কারণ পূর্বে একবার নূরী আর বনহুরকে নিয়ে বেশ একটা আলোড়ন শুরু হয়েছিলো আস্তানায়। হয়তো দাইমা আবার এই ব্যাপার নিয়ে রাগান্বিত হয়েছে ভীষণভাবে।

প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে বললো নূরী—আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে হুর?

না দিয়ে তো কোনো উপায় দেখছি না নূরী?

নূরী ব্যাকুলভাবে বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরে—হুর!

এবার হেসে উঠে বনহুর —ঠিক তার উল্টো।

মানে?

মানে তোমাকে এখন থেকে দাইমা তার কাছে শোবার জন্য জায়গা দেবেন না।

এসব কি বলছো হুর?

এতো সহজ কথাটা বুঝতে পারছো না?

না।

চলো তীরে গিয়ে বসি?

চলো।

ঝরণার তীরে এসে পাশাপাশি বসে ওরা। নূরী নিজের ওড়নাখানা ভাল করে নিংড়ে নিয়ে বনহুরের ভিজে চুলগুলো বেশ করে মুছে দেয়, তারপর আংগুল দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে দিয়ে বলে—বলো?

বনহুর আর নূরী ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

বনহুর বলে—দাইমার আদেশ আমাকে বিয়ে করতে হবে।

বিয়ে।

হাঁ। আমি যে শুধু একটি নয়, দুটি মেয়ের নাগপাশে আবদ্ধ হয়েছি, এ কথা দাইমা জানে না। জানে না বলেই সে আমাকে ধরে বসেছে বিয়ে করতে হবে।

এবার হাসে নূরী—বেশ তো, আর একটি নারীকে নতুন করে বৌ বানিয়ে নিয়ে এসো হুর?

সর্বনাশ, দু'জনার মান-অভিমান ভাঙ্গাতেই আমার অবস্থা কাহিল আবার? তা ছাড়া দাইমার পছন্দ-করা মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে।

দাইমার পছন্দ-করা মেয়ে?

হাঁ, আর সে মেয়ে হলে তুমি। নূরীর বুকে আংগুল রেখে দেখালো বনহুর। একটু থেমে বললো—লৌকিকতাপূর্ণ বিয়ে, যা আমাদের দুজনার হয়নি।

নূরী লজ্জায় মাথাটা নিচু করলো।

বনহুর বললো—দেখলে দূরে সরে যাওয়া তো দূরের কথা, তোমাকে আর আমাকে আরও নিবিড় করে বাঁধবার আয়োজন চলছে।

নূরী আনন্দে অধীর হয়ে বনহুরের প্রশস্ত লোমশ বুকে মাথা রাখে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—হুর।

বনহুর ওর চিবুক ধরে উঁচু করে তোলে—নূরী তুমি কাঁদছো? তোমার চোখে পানি কেন।

হুর, আমার মনে যে আনন্দ হচ্ছে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

তাই চোখের পানিতে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছো বুঝি?

চলো, ফিরে যাই।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো—চলো।

আস্তানায় ফিরে নূরী বনহুরকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়ে বললো—যাও হুর মনিরা আপার সঙ্গে দেখা করে এসো গে।

আজই তো আস্তানায় এলাম, কাল না হয় যাবো?

না, তা হয় না, তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এসো হুর, তারপর---ফিক করে হাসে নূরী বনহুরের দুষ্টামিভরা চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে।

বনহুর নূরীকে ধরতে চায় কিন্তু ধরতে পারে না, ছুটে বেরিয়ে যায় নূরী কক্ষ থেকে।

রহমান বাইরে এসে দাঁড়ায়—সর্দার!

বনহুর বলে—এসো রহমান।

সর্দার, তাজ প্রস্তুত।

তাজকে প্রস্তুত করার জন্য কে নির্দেশ দিয়েছিলো রহমান?

নূরী। নূরী বলেছিলো আপনি কান্দাই শহরে যাবেন।

হাঁ যাবো। একবার মনিরার সঙ্গে দেখা করে আসি। রহমান?

বলুন সর্দার?

বসো, কথা আছে কয়েকটা।

বনহুর বসলো, রহমানও আসন গ্রহণ করলো, এবার।

রহমান ভাবছে কি এমন কথা আছে হঠাৎ এই অসময়ে। প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায় সে সর্দারের ভাবগম্ভীর মুখমন্ডলে।

বনহুরের কপালে চিন্তারেখাগুলো দড়ির মত ফুলে উঠে। কি যেন ভাবে সে চোখ দু'টো নিচের দিকে রেখে। তারপর হঠাৎ করেই বলে উঠে—রহমান চৌধুরী বাড়ি যাওয়া আমার এখন বড় মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

সর্দার!

হাঁ রহমান কারণ নূর এখন বুঝতে শিখেছে জানতে শিখেছে। আমি চাই না নূর আমার পরিচয় জানুক।

সর্দার, চিরদিন আপনি---

হাঁ রহমান, নূরের কাছে আমি চিরদিন আত্মগোপন করে থাকবো। আমি চাই না নূর আমার মত উচ্ছৃঙ্খল হোক। আমি চাই না নূর আমার মত মায়ের বুকে ব্যথা দিক। আমি চাই না তার জন্যে তার মা অশ্রু বিসর্জন করুক। না না, তা হয় না, আমি নিজকে কঠিন করে নিয়েছি রহমান, আমি নিজেকে কঠিন করে নিয়েছি। নূর জানে তার পিতা কোথাও গেছে--

সর্দার, আমাকে সে কতদিন বলেছে—কাক্কু, আমার বাপু আর আসে না কেন?

তুমি কি জবাব দিয়েছো রহমান?

বলেছি তুমি যখন বড় হবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে তখন তোমার বাপু আসবেন।

ভালোই বলেছো। কিন্তু আমি ভাবছি, মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার দুরূহ হয়ে উঠেছে।

সর্দার বৌরাণী যে আপনার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আর চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বৌরাণীর দুঃখ আমার আর সহ্য হয় না সর্দার। আপনি তার সঙ্গে দেখা করুন।

দেখা তো করবো, ভাবছি হঠাৎ যদি নূর আমাকে দেখে ফেলে?

দেখলে আপনাকে চিনবে না সে, কত ছোট্টটি সে দূরে সরে পড়েছে আপনার কাছ থেকে।

হাঁ, সে কথা সত্য নূর আমাকে দেখলে চিনবে না। কারণ বহুদিন সে আমাকে দেখেনি-তার বুদ্ধি হবার পর থেকে। কিন্তু সে যদি তার মায়ের কাছে আমাকে কথা বলতে দেখে তাহলে তার কচি মনে---না না রহমান, আমি চৌধুরী বাড়ি যেতে পারবো না।

সর্দার, আপনি এক কাজ করুন।

বলো রহমান?

আপনি আত্মগোপন করে না গিয়ে প্রকাশ্যে চৌধুরী বাড়ি যান। বৌরাণী আর আম্মাকে বারণ করে দেবেন তারা যেন নূরের কাছে আপনার আসল পরিচয় না দেন। চৌধুরী বাড়িতে আপনার পরিচয় কেউ জানে না আম্মা, বৌরাণী আর সরকার সাহেব ছাড়া।

ঠিক বলেছো রহমান। বনহুরের মুখে প্রসন্ন ভাব জেগে উঠে।

রহমান খুশি হয়।

❑

কান্দাই শহরের জর্দানা পথটা সবচেয়ে নির্জন, জনবিহীন পথ বললেই চলে। বনহুরের অশ্ব এ পথেই এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ পথ ঝাপসা অন্ধকার হয়ে এসেছে। এ পথে যানবাহনও খুব কমই চলাফেরা করে কাজেই এ পথটাই বনহুরের শহরে আসার একমাত্র নিরিবিলি পথ।

শুধু আজ নয় বহুদিন বনহুর জর্দানা পথ দিয়ে এসেছে—আবার ফিরে গেছে। জর্দানা কান্দাই হয়ে চলে গেছে ফুলাগুর দিকে। ফুলাগু যাওয়া বিভিন্ন পথ এবং উপায় থাকায় এ পথে লোকজন বড় একটা পা বাড়ায় না। অবশ্য কারণও আছে—পথটা অত্যন্ত দুর্গম এবং ভয়াতুর। এ পথে চলতে গেলে চোর-ডাকাত বদমাইশের কবলে পড়া অস্বাভাবিক নয়। তাই সহসা কোনো পথিককে এ পথে দেখা যায় না।

বনহুরের অশ্ব তাজ উল্কা বেগে ছুটছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মোটর গাড়ি বেগে চলে গেলো বনহুরের অশ্বের পাশ কেটে। গাড়িখানার চলার গতি দেখে বনহুরের মনে কেমন যেন সন্দেহের দোলা জাগলো। তাজের লাগাম টেনে ধরলো বনহুর, পরমুহূর্তে তাজের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গাড়িখানাকে উদ্দেশ্য করে ছুটলো, গাড়িখানা তখন বহুদূরে এগিয়ে গেছে। ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইলের বেশি বেগে গাড়িখানা চলছে।

বনহুর তাজের লাগাম টান দিয়ে বললো—তাজ, যেমন করে হোক গাড়িখানা ধরতেই হবে।

তাজ যেন প্রভুর কথা বুঝতে পারলো, তার চলার গতি বেড়ে গেলো আরও দ্বিগুণভাবে।

পথ সোজা, তাই গাড়িখানা দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্ধান হতে পারলো না। তীব্র গতিতে গাড়িখানা সরে যাচ্ছে। হয়তো বুঝতে পেরেছে অশ্বারোহী তাদের গাড়ি ফলো করছে।

বনহুরের অশ্ব তাজ, যে কোনো যানবাহনের চেয়ে তার গতি কম নয়। প্রভুর উদ্দেশ্য তাকে সফল করতেই হবে।

বনহুর প্রায় গাড়িখানার কাছাকাছি এসে পড়েছে। গর্জে উঠলো বনহুরের রিভলভারখানা।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের গাড়ির পিছন চাকা ফেঁসে যাওয়া বেলুনের মত চুপসে গেলো। থেমে গেলো গাড়িখানা।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে পড়ার পূর্বেই গাড়ির দরজা খুলে কয়েকজন গুন্ডার মত লোক নেমেই পালাতে গেলো। একজনের কোলে একটা শিশু—বছর ছ'সাত হবে।

মুহূর্ত বিলম্ব হলো না বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকগুলোর উপর। এক-এক ঘুষিতে এক-এক জনকে ধরাশায়ী করলো। উঠি পড়ি করে কে কোন

দিক পালালো তা ঠিক নেই। যে লোকটা ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে পালাতে যাচ্ছিলো, বনহুর পিছন থেকে জামার কলার টেনে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে ওরা কাছ থেকে টেনে নিয়ে এক ঘুষি বসিয়ে দিলো লোকটার নাকে।

লোকটা প্রথমে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো, তারপর উঠেই দিলো ভো দৌড়। কে কোন্ দিকে পালালো তার ঠিক নেই। নিমিষে গাড়িখানা আশেপাশে জনশূন্য হয়ে পড়লো। গুন্ডাদল হাওয়ায় উড়ে গেছে যেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না। বনহুর এবার কোলের বাচ্চাটার প্রতি লক্ষ্য করলো। এতোক্ষণ ছেলেটা কোনো শব্দ করছে না বলে অবাক হয়ে গিয়েছিলো, এবার দেখলো, ছেলেটার মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা রয়েছে। দ্রুতহস্তে বাচ্চার মুখের বাঁধন মুক্ত করে দিয়ে ভাল করে তাকালো বনহুর, গাড়ির সার্চলাইটের আলোতে চমকে উঠলো—এ যে তারই সন্তান নূর! সঙ্গে সঙ্গে নিজকে সংযত করে নিলো বনহুর। সে চিনতে পারলেও নূর তাকে চিনতে পারেনি, কারণ বহুদিন পূর্বে নূরের দৃষ্টির আড়ালে সরে পড়েছে সে। বনহুর নিজেও আজ নূরকে চিনতে পারতো না, যদি না সে মাঝে মাঝে তাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে থাকতো।

নূরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ নয়নে তাকিয়ে থেকে শান্ত স্বরে বলে—খোকা, তোমার নাম কি?

কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে—আমার নাম নূর, ভালো নাম মাসুম চৌধুরী।

এদের হাতে কি করে পড়েছিলে?

বাগানে খেলা করছিলাম, ওরা সেই সময় আমাকে ধরে এনেছে। আমার মা অনেক কাঁদছে---তুমি কে? আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো---কেঁদে ফেললো নূর ফুঁপিয়ে।

বনহুর পারলো না নিজেকে সংযত রাখতে, ওকে চেপে ধরলো বুকে আদর করে মাথায় পিঠে হাত বুলাতে লাগলো।

নূর তো অবাক হয়ে গেছে, ওরা তাকে কত কষ্ট দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলো, একটুও তো আদর করেনি—আর কে এই লোকটা যে তাকে গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে, তারপর বুকে চেপে কত আদর করছে। নূর যেন হতভম্ভ হয়ে পড়ছে একেবারে। নূর লোকটাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না তবু বুঝতে পারছে লোকটা খুব ভাল মানুষ। অন্ধকারেই অবাক হয়ে দেখছে তাকে—মোটরের সার্চলাইটের আলোতে অবাক হয়ে

দেখছে তাকে—মোটরের সার্চলাইটের আলোতে যতটুকু দেখলো কচি নূরের কাছে বড় ভাল লাগলো ওকে, বড় সুন্দর লাগলো।

বনহুরের সম্বিৎ ফিরে এলো, এখানে এভাবে বিলম্ব করা উচিত নয়—বিশেষ করে নূরের জন্য। তাড়াতাড়ি নূরকে নিয়ে তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো।

তাজ খুশিতে শব্দ করলো চিঁহিঁ চিঁহিঁ--

বনহুর নূরকে কোলে করে তাজের পিঠে বসে লাগাম টেনে ধরলো।

তাজ এবার ছুটতে শুরু করলো।

সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে নূর কুঁকড়ে বসে আছে পিতার কোলের মধ্যে কিন্তু জানে না কার কোলে বসে আছে সে।

আকাশে ফুটে উঠলো অসংখ্য তারার প্রদীপ।

পথের অন্ধকার সচ্ছ হয়ে এসেছে অনেক, বনহুর অশ্বের গতি কমিয়ে দিলো কারণ প্রবল বাতাসে নূরের হাড়ে কাঁপন ধরছে। বনহুরের হাতের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে নূরের ছোট্ট দেহটা ঠান্ডায় না ভয়ে তা ঠিক বুঝা যাচ্ছে না।

বনহুর বললো—নূর, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

শীত করছে আমার।

এই তো আর বেশি পথ নেই, এসে পড়েছি প্রায় তোমাদের বাড়িতে।

তুমি আমাদের বাড়ি চিনলে কি করে?

নিজ সন্তানের প্রশ্নে হকচকিয়ে গেলো বনহুর, নূরের কথায় হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলো না, আমতা আমতা করে বললো—নূর, আমাকে তুমি চেনো না, আমি কিন্তু তোমাকে চিনি। অনেকদিন আগে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে তুমি?

হাঁ।

কেন গিয়েছিলে?

তোমার আব্বার বন্ধু আমি, তার সঙ্গেই তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন তুমি খুব ছোটো ছিলে।

বনহুরের কথায় খুশি হলো নূর বললো—তুমি আমার আব্বুর বন্ধু?

হাঁ।

তোমার নাম কি বলো না?

আমার নাম, আমার নাম--

ভুলে গেছো বুঝি?

হাঁ--না---মানে--

মনে নেই এই তো?

ঠিক বলেছো নূর।

নিজের নাম কেউ ভুলে যায় বুঝি?

বনহুর এবারও বেশ ঘাবড়ে গেলো, ঢোক গিলে বললো—আমার নাম দুটো, কোনটা তোমাকে বলবো তাই ভাবছি।

দুটোই বলো? দেখলে না আমার দুটো নাম কেমন তোমাকে শুনালাম।

আচ্ছা বলছি। —বনহুর ভাবে---এই নামের মধ্যেই তার নূর তাকে চিরদিন মনে রাখবে তাই যা তা একটা নাম চট করে বলতে পারে না।

কি ভাবছো?

ভাবছি তোমার বাসায় গিয়ে নামটা বলবো।

না, তা হবে না, তুমি এক্ষুণি বলো?

আমার নাম বড্ড খারাপ, তাই বলতে লজ্জা করছে।

কত সুন্দর তুমি, আর তোমার নাম অতো খারাপ কেন? যাক তুমি বলো আমার পছন্দ না হলে আমি পাল্টে রাখবো।

নিশাচর। আমার নাম নিশাচর—দেখলে কেমন বিশ্রী নামটা আমার।

ছিঃ ছিঃ এমন নাম তোমার বাবা-মা তোমাকে কেন দিয়েছিলো? বলো তোমার আর একটা নাম কি?

রাত চোরা!

এবার নূর হেসে উঠে বনহুরের কোলের মধ্যে, দুলে উঠে ওর কচি শরীরটা।

বনহুরও হাসে।

নূর বলে—বলো না কেন এমন বিশ্রী নাম তোমার রেখেছিলো?

একটু ভেবে বলে বনহুর—আমি রাতের বেলায় বেড়াতে ভালবাসি কি না, তাই আমার বাবা সখ করে আমার নাম রেখেছিলেন নিশাচর।

আর রাতচোরা নামটা তোমার কে রেখেছিলো?

আমার মা।

কেন? তুমি বুঝি রাতে চুরি করে খেতে?

ঠিক ধরেছো নূর। বাঃ তুমি কেমন করে জানলে আমি রাতের বেলায় দুধ চুরি করে খেতাম?

এ তো রাতচোরা মানে রাতে যে দুধ চুরি করে খায়। জানো, আমার মা বলে—রাতচোরা পাখী আছে, তারা রাতে চোখে দেখে, দিনে অন্ধ হয়ে থাকে।

ঠিক তোমার মা আমার মতো পাখীর কথা বলেছেন। আমিও রাতে চোখে দেখি, দিনে দেখি না।

এ্যা কি বললে? তোমার অমন ডাগর ডাগর চোখ আর দিনে চোখে দেখো না? আচ্ছা মাকে বলবো তোমার কথা।

তুমি যে আমার কি নাম দেবে বলেছিলে?

একটা ভালো নাম দিতে হবে তো? বাসায় নিয়ে চলো, মা আর দাদীকে বলে তোমার নতুন নাম দেবো।

তুমিই না হয় বুদ্ধি করে একটা নাম আমাকে দিলে?

দাঁড়াও মনে করি। তুমি এবার জোরসে ঘোড়া চালাও দেখি।

ভয় করবে না তো তোমার?

আমি ভয় করবো কি যে বলো? খুব জোরে চালাও।

যদি পড়ে যাও?

তোমার কোলে থাকতে কিছুতেই পড়বো না।

নূরকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরে বনহুর। তাজ তখন দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চৌধুরীবাড়ির সম্মুখে এসে তাজের পিঠ থেকে নেমে পড়লো বনহুর নূরসহ।

বনহুর নূরকে নামিয়ে দিতেই বলে উঠে নূর—তোমার নাম আমি চাঁদ রাখলাম।

হেসে উঠলো বনহুর, সে ভেবেছিলো নূর এতোক্ষণে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছে। কিন্তু আশ্চর্য সে ভোলেনি এতোটুকু; ভেবেছে কি নাম দিলে ওকে সুন্দর মানাবে। কচি নূরের কাছে সবচেয়ে প্রিয় আর সুন্দর বুঝি চাঁদ তাই সে ঐ নামটাই তার জন্য খুঁজে খুঁজে বেছে নিয়েছে।

বনহুর বললো—বেশ তাই হবে।

নূর বনহুরের কোল থেকে নেমে ছুটে যায় অন্দর বাড়ির মধ্যে।

চৌধুরী বাড়িতে তখন গভীর একটা শোকের ছায়া নেমে এসেছে, বিকেলে বাগানে খেলা করার সময় কে বা কারা নূরকে চুরি করে নিয়ে গেছে। সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা হয়েছে কোথাও নূরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মরিয়ম বেগম একমাত্র নাতির অন্তর্ধানে পাগলিনী হয়ে পড়েছেন। কাকে কোথায় পাঠাচ্ছেন তার ঠিক নেই। তিনি সবাইকে বলেছেন যে আমার নাতি নূরকে এনে দেবে তাকে আমার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেবো।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব লোকজন নিয়ে শহরে ঢেরা পিটিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। নূরের চেহারা বর্ণনা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এসেছেন।

মনিরা তো একেবারে পাথরের মূর্তি বনে গেছে। নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে, মুখে তার কোনো কথা নেই।

হঠাৎ তার কানে যায় নূরের কন্ঠস্বর—আম্মি আম্মি আমি এসেছি, আমি এসেছি--

মনিরার চোখমুখ মুহূর্তে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে—বাপ নূর নূর---ওরে নূর তুই এসেছিস ছুটে বেরিয়ে আসে মনিরা ঘরের ভিতর থেকে।

মরিয়ম বেগম তখন এশার নামায পড়ছিলেন খোদার কাছে তিনি কেঁদে কেঁদে মোনাজাত করছিলেন একমাত্র বংশপ্রদীপকে ফিরিয়ে দাও খোদা-- নূরের কন্ঠস্বর শোনামাত্র অনাবিল এক আনন্দ স্রোত বয়ে যায় তাঁর অন্তরে।

মাকে জড়িয়ে ধরে নূর-আম্মি--

মনিরা পুত্রকে বুকে তুলে নিয়ে গলায় মুখে চুমা দিয়ে বলে—বাবা, কোথায় গিয়েছিলি? কে তোকে নিয়ে গিয়েছিলো?

আম্মি, ডাকাত আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। হেঁ ইয়া মোটা লোকগুলো কি ভীষণ চেহারা---

হায় হায় কি করে ফিরে এলি বাপ?

চাঁদ, চাঁদ আমাকে ডাকাতের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। জানো আম্মি, চাঁদের গায়ে ভীষণ জোর। অনেকগুলো লোককে সে এক এক ঘুষিতে কাবু করে ফেলেছে। সবাই ভয় খেয়ে পালিয়ে গেলো চাঁদ আমাকে নিয়ে চলে এলো।

অবাক কন্ঠে বললো মনিরা—চাঁদ! চাঁদ কে বাবা?

চাঁদকে চেনো না আম্মি? চাঁদ আমার আব্বুর বন্ধু।

তোমার আব্বুর বন্ধু—কে সে বাবা?

বললাম তো চাঁদ। এসো, চাঁদ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দেখা করবে না?

ততক্ষণে মরিয়ম বেগম এবং সরকার সাহেব এসে পড়েছেন নূরকে দেখতে পেয়ে সবাই খুশি হয়ে উঠেছেন। সকলের চোখে মুখেই আনন্দ উচ্ছ্বাস।

মনিরা বললো—মামীমা, নূরকে চাঁদ না কি নাম সেই নাকি উদ্ধার করে এনেছে। বাইরে চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে দেখা করবে?

মরিয়ম বেগম নূরকে তুলে নিয়ে বুকে জাপটে ধরেন—দাদু! কোথায় গিয়েছিলি দাদু?

সরকার সাহেব বললেন—যাই দেখি কে সে--

কথা শেষ হয় না, নূর মরিয়ম বেগমের কোল থেকেই বলে উঠে ঐ তো চাঁদ এসে গেছে।

এক সঙ্গে সিঁড়ির নিচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সবাই।

মুহূর্তে মনিরার চোখ আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠে,দীপ্ত হয়ে উঠে তার মুখমন্ডল। স্বামীকে দেখবে সে ভাবতেও পারেনি এই ক্ষণে।

মরিয়ম বেগম উচ্ছল কণ্ঠে ডেকে উঠেন —বাবা মনির --

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ঠোঁটের উপর আংগুল চাপা দেয়, চুপ থাকতে ইংগিত করে সে।

বৃদ্ধ সরকার সাহেবের ঘোলাটে চোখে খুশির আলো জ্বলে উঠে যেন, তিনি মনে মনে খোদার দরগায় শুকরিয়া করেন। বহুকাল তিনি এ বাড়ির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। নূর হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়ায় তিনি একেবারে মুষড়ে পড়েছিলেন। নূর এবং মনিরাকে এক সঙ্গে দেখে বুক ভরে উঠলো কানায় কানায়।

নূর মরিয়ম বেগমের কোল থেকে নেমে ছুটে গেলো বনহুরের পাশে —চাঁদ এই দেখো আমার দাদী, এটা আমার মা।

বনহুর শুধু হাসতে লাগলো।

সরকার সাহেব বললেন—নূর, চাঁদ ওর নাম কে বললো দাদু তোমাকে?

মনিরা তখন স্বামীর দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক নয়নে।

মরিয়ম বেগম বললেন—মনির---

বনহুর মায়ের কানের কাছে একটু নিচু হয়ে মুদৃস্বরে বললো—মা, ও নামে এখন ডেকো না। নূর আমার নাম চাঁদ দিয়েছে সেই নামেই ডাকবে। আমি চাই না নূর আমার পরিচয় জানতে পারুক।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগম—বাবা---

মা---

চল্ ঘরে চল্ বাবা---

বনহুর নিচু স্বরে মায়ের সঙ্গে কথা বললেও মনিরা সব বুঝতে পারলো। পিতা-পুত্রের মধ্যে কোনো পরিচয় ঘটেনি এখনও এটাও সে বুঝতে পারলো সঠিকভাবে। বললো মনিরা—বাবা নূর, চাঁদকে তুমি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও। চাঁদ তোমাকে ডাকাতের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছে—কম কথা নয়।

অবশ্য কথাটা বলতে মনিরার বুকের মধ্যে ভীষণভাবে ব্যথা লাগছিলো। পুত্রের কাছে পিতার পরিচয় গোপন রাখতে হচ্ছে, এটা কি কম দুঃখ।

মায়ের কথায় নূর খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো, বনহুরের হাত ধরে তাকে নিয়ে চললো বসবার ঘরের দিকে—এসো চাঁদ, আমার সঙ্গে এসো।

মরিয়ম বেগম বললেন---দাদু, তোমার আব্বুর বন্ধু তাকে হলঘরে নিচ্ছো কেন? আমার ঘরে নিয়ে যাও।

দাদী, তুমি রাগ করবে নাতো?

না না, রাগ করবো কেন।

মরিয়ম বেগমের ঘরে পুত্র পিতাকে নিয়ে এসে বসালো। তারপর ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলো মায়ের কাছে---মাম্মি, চাঁদকে কিছু খেতে দেবে না? চাঁদ আমাকে কত কষ্ট করে রক্ষা করেছে।

মরিয়ম বেগম বললেন---যাও বৌমা, ওর জন্য খাবার নিয়ে যাও। নূর, এসো দাদু, আমি তোমার চাঁদের পুরস্কারের জন্য কিছু নিয়ে আসি।

মরিয়ম বেগমের হাত ধরে বলে নূর---আমার চাঁদকে পুরস্কার দেবে দাদী?

হাঁ, তোমাকে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছে—পুরস্কার দিতে হবে না? কিন্তু কি দেই বলতো দাদু?

টাকা। দাদী, আমাদের তো অনেক টাকা আছে, ওকে বেশি করে টাকা দিয়ে দাও না।

টাকা ও নেবে না দাদু।

তবে কি নেবে--দাঁড়াও আমি জিজ্ঞাসা করে আসি?

না না, এখন চলো, সরকার সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিগে। মরিয়ম বেগমের উদ্দেশ্য নাতীকে ধরে রাখা। কতদিন পর স্বামীকে পেয়েছে মনিরা এ সময় নূরের সরে থাকাই প্রয়োজন কত কথা আছে দু'জনার মধ্যে।

এদিকে যখন নূর আর দাদী চাঁদের পুরস্কার নিয়ে চিন্তা করছে তখন মনিরা খাবার থালা নিয়ে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে—পুত্রের কাছে পিতা হয়ে ছলনা -কতবড় নিষ্ঠুর তুমি। আকাশের চাঁদ মানুষের ধরা ছোয়ার বাইরে, তাই তুমি নিজকে আকাশের চাঁদের মতই--

বনহুর মনিরাকে নিবিড় করে টেনে নেয়—তোমার কাছে নয়। স্ত্রীর রক্তিম গন্ডে ওষ্ঠদ্বয় রেখে বলে—লক্ষ্মীটি আমাকে ভুল বুঝো না।

কিন্তু আজ তুমি কতখানি ভুল করলে জানো? চিরদিনের জন্য নূরের সামনে তুমি আমার কাছে পর হয়ে গেলে। ওর সামনে কোনোদিনই আমি তোমাকে নিজের করে ভাবতে পারবো না।

মনিরা জানো না এতে তোমার চেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছি আমি। কতখানি নাচার হয়ে আমি আজ নূরের কাছে নিজেকে গোপন করলাম। মনিরা, আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলে মনিরা—এতদিন কোথায় ছিলে বলো তো?

সে অনেক দূরে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলাম। সে দেশের রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি যেমন, তেমনি হয়েছি মর্মাহত। নিরিবিলি বলবো একদিন সে দেশের কাহিনী।

মনিরা বললো—এবার খাও।

মুখে উঠিয়ে না দিলে আমি খাবো না।

হাসে মনিরা—এখনও তোমার সেই ছেলেমানুষি গেলো না। নাও -- খাবারের থালা থেকে খাবার তুলে স্বামীর মুখে তুলে দিতে থাকে।

বনহুর মনিরার হাত থেকে খাবার খেতে খেতে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সে তার মুখের দিকে। মনিরা লজ্জাভরা কণ্ঠে বলে—কি দেখছো?

তোমাকে।

আমাকে দেখছো? কেন বলো তো?

কতদিন তোমাকে দেখিনি মনিরা। বনহুর মনিরাকে তার বলিষ্ঠ বাহু দু'টি দিয়ে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে।

মনিরা স্বামীকে লক্ষ্য করে বলে—এখন যদি নূর এসে পড়ে?

মনিরা!

সে যদি কোনোদিন তোমার পাশে এমনি করে দেখে তবে চিরদিনের জন্য আমি তার কাছে কলঙ্কিনী হয়ে যাবো। একবার ভেবে দেখো কতবড় ভুল তুমি করেছো?

মনিরা, আমি নিরুপায়—নিরুপায় হয়েই তো এ কাজ করেছি। নূরকে তুমি মায়ের ঘরেই রেখো।

মায়ের ঘরেই থাকে সে, তাই বলে চিরদিন তুমি চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে আসবে আমার ঘরে?

মনিরা, আমার জীবন যখন স্বাভাবিক নয় তখন চোরের মত পালিয়ে আসা-যাওয়া ছাড়া কিই বা উপায় আছে বলো?

মনিরা লক্ষ্মীটি---বনহুরের পুরু ওষ্ঠদ্বয় মনিরার গোলাপী সরু ওষ্ঠদ্বয়ের উপরে নেমে আসে গভীর আবেগে।

এমন সময় নূরের চঞ্চল কণ্ঠ শোনা গেলো—চাঁদ চাঁদ তোমার পুরস্কার এনেছি---

মনিরা স্বামীর সবল বাহু থেকে নিজকে দ্রুত মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়ালো।

নূর কক্ষে প্রবেশ করলো, তার পিছনে মরিয়ম বেগম। হাস্যোদ্দীপ্ত তাঁর মুখমন্ডল।

নূর কক্ষে প্রবেশ করেই বললো—চাঁদ বলো তুমি কি নেবে?

মরিয়ম বেগম হেসে বললেন—ওকে তুমি রক্ষা করেছো বলে ও তোমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চায়—নাও চাঁদ।

বনহুর মায়ের মুখে তাকিয়ে হাসলো, তারপর নূরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চিবুকে মৃদু চাপ দিয়ে বললো—কি পুরস্কার দেবে নূর?

নূর হাত দু'খানা উঁচু করে বললো—এই থলে দুটোতে তোমার জন্য পুরস্কার এনেছি। একটি দেবো, দু'টি নয়—বলো কোনটি তুমি নেবে?

বনহুর দেখলো, একটি থলে বেশ বড়োসড়ো আর একটি থলে খুব ছোট।

বনহুর বুঝতে পারলো, বড় থলেটার মধ্যে টাকার গাদা আছে। আর ছোটটার মধ্যে কি আছে ঠিক বুঝা যাচ্ছেনা। বনহুর নূরের দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরলো—এর মধ্যে যা আছে তাই নেবো।

হেসে উঠলো নূর—তুমি বড্ড ঠকে গেছো চাঁদ।

নূর ছোট্ট থলেটার মুখ খুলে ফেললো—এটা আমার হাতের বাজুবন্দ। আমার আব্বু আমাকে দিয়েছিলো।

আনমনা হয়ে যায় বনহুর, একটু ভেবে বলে—এটা কেন দিচ্ছো নূর?

তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো তাই আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা আমি তোমাকে দিলাম। জানো চাঁদ আমার আব্বু আমাকে সখ করে এটা তৈরি করে দিয়েছিলো। এই যে পাথর দেখছো এটার দাম অনেক অনেক টাকা---

বনহুর নূরকে জাপটে ধরলো বুকের মধ্যে, চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠলো, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো— তোমার সখের জিনিস আমি নিতে পারবো না নূর। ওটা তোমার হাতেই পরিয়ে দি।

না, তোমাকে নিতেই হবে ওটা। আর বলো আবার আসবে তো? আমার আব্বু এলে তোমাকে দেখে অনেকে খুশি হবেন। আম্মি, চাঁদকে আবার আসতে বলে দাও না?

বনহুর একবার মা ও স্ত্রীর মুখে তাকিয়ে নিয়ে নূরকে আদর করে বললো— আসবো। কিন্তু এটা আমি নেবো না।

আমি তাহলে কাঁদবো।

মরিয়ম বেগম বললেন—ওর যখন এতো সখ তবে নাও চাঁদ।

বনহুর কিছুতেই যেন ধৈর্য ধরতে পারছিলো না, তাড়াতাড়ি বাজু বন্দটা পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালো—চললাম। খোদা হাফেজ।

বনহুর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো।

ছোট্ট নূরের মনটা সে অধিকার করে নিয়ে চলে গেলো নতুন মানুষ হিসাবে।

মনিরা নূরকে বুকে চেপে ধরলো।

নূর মায়ের মুখে দৃষ্টি ফেলে বললো—আম্মি, তুমি কাঁদছো? চাঁদ খুব ভাল মানুষ, তাই না?

হাঁ বাবা। বললো মনিরা।

মরিয়ম বেগম মনিরার কোলের কাছ থেকে নূরকে টেনে নিয়ে বললেন চল্ আমার ঘরে চল্ নূর।

মরিয়ম বেগমের সঙ্গে চলে গেলো নূর।

মনিরা নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

❑

রাত গভীর হয়ে এলো একসময়ে।

মনিরার চোখে তন্দ্রা নেমে আসে।

হঠাৎ কারো স্পর্শে তন্দ্রা ছুটে গেলো মনিরার, চোখ তুলে তাকাতেই ডিম লাইটের আলোতে স্বামীর দীপ্তমুখখানা নজরে পড়লো। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো মনিরা, স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ রেখে বললো—এতো কাঁদাতে পারো তুমি?

মনিরা! ইচ্ছা করে আমি কাউকে কাঁদাই না।

বনহুর মনিরার অশ্রু হাত দিয়ে মুছে ললাটের চুলগুলো সরিয়ে দিলো আলগোছে।

বললো মনিরা—এমনি করে আর কতদিন কাটবে?

যতদিন আকাশে চাঁদ হাসবে। সত্যি মনিরা নূরের দেওয়া নামটা আমাকে চাঁদের মতই সচ্ছ করে দিয়েছে। জীবনে কত পাপ আমি করেছি কত পাপ---

এ সব আবার বলছো কেন? চুপ করো।

মনিরা, মাঝে মাঝে আমি যে কোথায় হারিয়ে যাই কোন অতলে তলিয়ে যাই, যেখানে কোনো সীমানা আমি খুঁজে পাই না।

ওগো কতদিন পর এসেছো, এ সময় যদি ব্যথা আর দুঃখের কথা নিয়েই কাটাবে তাহলে হাসবে কখন বলোতো? কতদিন তোমার সেই হাসি দেখিনি।

মনিরা, তোমার পবিত্র পরশে আমার পাপগুলো ধুয়ে মুছে দাও। আমাকে পাপমুক্ত করে দাও মনিরা....

মনির!

ডাকো, আর একবার ডাকো মনির বলে।

মনিরা, তুমি যে অতি পবিত্র—নিষ্পাপ.....

কিন্তু নিজকে পবিত্র, নিষ্পাপ রাখতে পারলাম কই। তোমার কাছে আমি চরম অপরাধী।

এ তুমি কি বলছো?

আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমাকে তুমি ক্ষমা করো মনিরা। তুমি নির্মল, নিষ্পাপ, পবিত্র, কেন আমি তোমার এই সুন্দর ফুলের মত জীবন......

মনিরা, স্বামীর মুখে হাতচাপা দেয়—না না, চুপ করো তুমি।

মনিরা একটা কথা তোমাকে বলবো, আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবে তো?

না, আমি তোমার কোনো কথা শুনবো না। শুনতে চাই না।

আমি যে তোমাকে না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না মনিরা?

কিন্তু আমি তোমার কোনো কথাই শুনতে রাজি নই।

না বললেই যে নয়!

পরে শুনবো, কতদিন পর আজ তোমাকে পেয়েছি, না জানি কি কথা শুনতে কি কথা শুনবো, হয়তো সহ্য করতে পারবো না!

মনিরা স্বামীকে ভাবাপন্ন হতে দেখে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

মনিরা স্বামীকে ভাবাপন্ন হতে দেখে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো—কি ভাবছো এতো?

কিছু না! বনহুর নিজকে প্রসন্ন করে নেওয়ার চেষ্টা করলো।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রাখলো।

❑

দাইমার নির্দেশে বনহুর নূরীকে গ্রহণ করলো স্ত্রী রূপে। মহা উৎসবের মধ্যে শেষ হলো দস্যু বনহুরের লৌকিকতাপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠান। নূরী একান্ত নিজের করে পেলো এবার বনহুরকে।

সার্থক হলো আজ নূরীর জীবন।

সমস্ত আস্তানায় খুশির উৎসব বয়ে চললো। দাইমার কথায় অনুচরদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হলো বহু সোনাদানা আর খানাপিনা। যে যা খেতে চায় তাই তারা খেতে পেলো।

কান্দাই আস্তানা ছাড়াও বনহুরের আরও কয়েকটা আস্তানা ছিলো। কান্দাই শহরের প্রথম আস্তানা পুলিশ হস্তগত করে নেবার পর কান্দাই শহরের এক প্রান্তে একটি পোড়োবাড়ির অভ্যন্তরে বনহুর গভীর মাটির নিচে এ আস্তানা গড়ে তুলেছিলো। এখানে যারা থাকতো তারা শহরের সংবাদ সংগ্রহ করতো নানা ছদ্মবেশে, জরুরি খবর হলেই ওয়্যারলেসে সংবাদ পাঠিয়ে দিতো বনহুরের কান্দাই জঙ্গলের ভূগর্ভস্থ আস্তানায়। বনহুর যে শয্যায় শয়ন করতো তার খাটের হাতলেই ছিলো ওয়্যারলেস। বনহুর সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পেতো এবং সেভাবে কাজ করতো।

আরও কয়েকটা আস্তানা ছিলো, এগুলো কালু খাঁর মৃত্যুর পর বনহুর কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করেছিলো। বনহুরের পক্ষে সবগুলো আস্তানায় যাওয়া সম্ভব না হলেও যোগাযোগ ঠিকই ছিলো। ওয়্যারলেসে প্রতিটি আস্তানার সংবাদ সে সংগ্রহ করতো ঠিকভাবে এবং সেভাবে কাজ করতো।

বনহুরের অনুপস্থিতকালেও এসব আস্তানার কাজে কোনো গোলযোগ হতো না। রহমান সূক্ষ্মভাবে পরিচর্যা করতো। এসব আস্তানার অনুচরগণ সবাই ছিলো অত্যন্ত বিশ্বাসী ও সাহসী।

বনহুরের প্রধান আস্তানা হলো কান্দাই জঙ্গলের ভূগর্ভ জঙ্গল গড় আস্তানা। এটা কালু খাঁ'র তৈরি আস্তানা। কান্দাই জঙ্গল ছোট-খাটো নয়, প্রায় হাজার মাইলব্যাপী এ জঙ্গল। কালু খাঁ জীবিতকালে কান্দাই জঙ্গলে পোড়াবাড়ির মধ্যে একটা আস্তানা গড়েছিলো। বিরাট আস্তানা—সেটা পুলিশ

ফোর্সের দ্বারা মিঃ জাফরী ধ্বংস করে ফেলেন। এ আস্তানা বিনষ্ট হওয়ায় বনহুরের ক্ষতি হয়েছিলো অনেক—কিন্তু তার পরপরই সে গড়ে নিয়েছিলো একটা নয়, কয়েকটা আস্তানা জবরু জঙ্গলে, নারুন্দী দ্বীপে, নগরগড় জঙ্গলে। প্রত্যেকটা আস্তানা বনহুর অত্যন্ত দক্ষ কারিগর মিস্ত্রি দ্বারা তৈরি করে নিয়েছিলো। শত চেষ্টাতেও এসব আস্তানার সন্ধান কোনো মানুষ পাবে না বা পেতে পারে না।

বনহুরের এই বিয়ের সংবাদ রহমান ওয়্যারলেসে তাদের সবগুলো আস্তানায় পৌঁছে দিলো। সর্দারের বিয়ের সংবাদ পেয়ে মহা ধুমধাম হলো সব আস্তানায়। নানারকম নাচ-গান চললো, খানাপিনাও হলো মহা সমারোহে।

জংলী মেয়ে নূরীর বিয়ে!

নূরীর সহচরী নাসরিন, সুরাইয়া, জেরিনা, এরা নূরীকে আজ ফুলে ফুলে ফুলরাণী সাজালো। হাতে-খোঁপায়-গলায়-মাজায় শুধু ফুল আর ফুলের গহনা।

তেমনি ফুল দিয়ে সাজালো তারা তাদের সর্দারের কক্ষটাকে—বাসরঘর হিসাবে যে কক্ষটা আজ ব্যবহার করবে দস্যু বনহুর। সভ্য-জগতের বেলী, চামেলী, গোলাপ নয়—বনফুল দিয়ে সাজানো হলো সব।

সহচরী পরিবেষ্টিত হয়ে নূরী যখন বাসরকক্ষে প্রবেশ করলো তখন তার অন্তরে এক অপূর্ব শিহরণ বয়ে গেলো। এই রাত তার কত কামনার, কত সাধনার, কত কল্পনার! নূরী ফুল দিয়ে সাজানো বাসরকক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো।

সহচরীগণ তাকে বাসরকক্ষে দিয়ে চলে গেলো।

নূরীর পরনে ঘাগড়া, গায়ে পাঞ্জাবী ধরনের জামা। আর ওড়না। ওড়নায় ঘোমটা দেওয়া মুখমন্ডল। মশালের আলোতে নূরীকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে আজ।

এগিয়ে আসে বনহুর নূরীর পাশে।

আজ তার দেহেও নতুন ড্রেস—দস্যুর জমকালো ড্রেস নয়। মূল্যবান পরিচ্ছদ তার দেহে বিরাজ করছে।

বনহুর নূরীর পাশে দাঁড়ালো, আংগুল দিয়ে ওড়নাটা উঁচু করে চিবুকটা তুলে ধরলো নূরী।

নূরী তার লজ্জাজড়িত ডাগর দু'টি চোখ তুলে তাকালো, মাথা রাখলো বনহুরের বুকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরের খাটের পায়ায় ওয়্যারলেসটা থেকে সাউন্ড ভেসে এলো।

বনহুর নূরীকে বাহুমুক্ত করে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো খাটের পাশে, ঝুঁকে পড়লো খাটের পায়ার দিকে!

ওয়্যারলেসে ভেসে এলো—সর্দার, সিন্ধি ঘাটি থেকে হারুন বলছি। বড় দুঃসংবাদ!

বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—দুঃসংবাদ? বলো কি দুঃসংবাদ?

ওয়্যারলেসে শোনা গেলো—সিন্ধি পর্বতের নিকটে সমুদ্র থেকে একটা অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর জীব উঠে এসে সিন্ধিবাসীদের উপর উপদ্রব শুরু করেছে। প্রতিদিন জীবটা আট-দশ জন লোককে হত্যা করে রক্ত পান করছে।

বনহুর অস্ফুট শব্দ করে উঠে—বলো কি হারুন!

সর্দার, আমাদের ঘাটিতেও জীবটি এসে পড়েছিলো। রওশন আলী আর ফরিদ মিয়াকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। পরদিন তাদের মৃতদেহ সমুদ্রের ধারে পাওয়া যায়। সর্দার, সিন্ধিবাসীদের জীবনে এক চরম বিপদ উপস্থিত হয়েছে! এই মুহূর্তে তারা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সর্দার আমরাও অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছি......

নূরীও বনহুরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো, সেও শুনতে পেলো হারুনের কথাগুলো, শিউরে উঠলো মনে মনে—এই শুভ মুহূর্তে একি অমঙ্গল সংবাদ! আশঙ্কাপূর্ণ ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সে বনহুরের মুখে।

বনহুর ওয়্যারলেসের নিকটে ঝুঁকে ছিলো, তেমনি ঝুঁকেই বললো—আমি রহমানকে সঙ্গে করে এখনি রওয়ানা দিচ্ছি।

ভেসে এলো হারুনের কণ্ঠ—সর্দার, বন্দুক, পিস্তল, রাইফেলের গুলী তাকে কিছু করতে পারে না। এমন কি সিন্ধি পুলিশবাহিনী কামান নিয়েও জীবটাকে আক্রমণ করেছিলো কিন্তু তার দেহের চামড়া কাটতে পারেনি।

হুঁ অত্যন্ত আশ্চর্য জীব! আচ্ছা, তোমরা প্রস্তুত থেকো, আমি আসছি। বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, একটু পূর্বে বনহুরের যে রূপ ছিলো সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে যেন মুহূর্তে। দেহের মাংসপেশীগুলো যেন শক্ত হয়ে উঠেছে লোহার মত। ভুলে গেলো বনহুর পাশে নববধূর বেশে দাঁড়িয়ে নূরী কলিং বেল টিপলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো—সর্দার!

ভিতরে এসো রহমান।

রহমান নতমুখে প্রবেশ করলো দস্যু বনহুরের বাসরকক্ষে।

ভাবলো সে, নিশ্চয়ই নূরীর সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য ঘটেছে বা ঐ রকম কিছু হয়েছে। কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো, সর্দার মেঝেতে পায়চারি করছে, নূরী চুপচাপ ফুলে ফুলে ফুলরাণী সেজে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে।

রহমান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই বনহুর পায়চারি ক্ষান্ত করে ফিরে তাকালো—রহমান, সিন্ধি ঘাটি থেকে সংবাদ এসেছে—বড় দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ?

হাঁ রহমান।

কোনো দুর্বৃত্ত কি আমাদের ঘাটিতে......

না, কোনো দস্যু বা দুর্বৃত্ত নয়, সিন্ধি পর্বতের নিকটে সমুদ্র হতে একটা ভয়ঙ্কর জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। অতি ভয়ঙ্কর জীব—বন্দুক, পিস্তল বা রাইফেলের গুলী তার দেহে বিদ্ধ হয়নি। কামানের গোলাও নাকি তাকে কাবু করতে পারেনি। প্রতি রাতে সে সিন্ধির পল্লীতে হানা দিয়ে আট-দশজন লোককে হত্যা করে। আমাদের ঘাটি থেকে দু'জনকে হত্যা করেছে......

সর্দার!

হাঁ, রওশন আলী আর ফরিদ মিয়াকে হত্যা করেছে। রহমান, এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন বোরহানকে সংবাদ পাঠিয়ে দাও, আজ রাতেই আমরা সিন্ধির পথে যাত্রা করবো। হাঁ শোন রহমান—বন্দুক, রাইফেল বা কামান দিয়েও নাকি জীবটাকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি!

রহমান বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠে— আশ্চর্য জীব বটে!

শুধু আশ্চর্যই নয় রহমান, অত্যন্ত সাংঘাতিক জীব। প্রতিদিন সিন্ধিবাসীদের বহু লোককে এ জীবটা হত্যা করে চলেছে। সিন্ধি পর্বতের পাশে সমুদ্র হতে এ জীবটার আবির্ভাব ঘটে থাকে।

সর্দার, এমন জীবকে হত্যা করা কি করে সম্ভব হবে? আর আমরা গিয়েই বা কি করতে পারবো, কামানের গোলা যে জীবকে হত্যা করতে পারেনি?

সেই কারণেই তো আমি যাবো রহমান, দেখবো কি জীব সেটা। আর দেখবো সিন্ধিবাসীদের রক্ষা করতে পারি কি না। শোন রহমান, ক্যাপ্টেন বোরহানকে জাহাজ ছাড়ার জন্য তৈরি হয়ে নিতে বলে আমার আস্তানার গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে কিছু গোলা-বারুদ আর আগ্নেয় অস্ত্র-শস্ত্র জাহাজে উঠিয়ে নাও, আর উঠিয়ে নাও আলোকরশ্মি স্তম্ভটা। ডবল ডায়নামা মেশিনটার সঙ্গে আলোকরশ্মি স্তম্ভ যোগ করে নিতে বলো।

সর্দার, আলোকরশ্মি স্তম্ভ আর ডবল ডায়নামা মেশিন এ দুটো যে অত্যন্ত......

কষ্টকর এইতো?

না সর্দার, অত্যন্ত বিপদজনক। আলোকরশ্মি স্তম্ভ ডবল ডায়নামায় সংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে আলোকরশ্মি স্তম্ভ থেকে যে আলোকরশ্মির উদ্ভব

হবে সে রশ্মি খুবই মারাত্মক। হঠাৎ যদি জাহাজের গায়ে কিঞ্চিৎ রশ্মি লেগে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যেতে পারে।

রহমান সেই কারণেই আমি আমার আস্তানার সবচেয়ে মারাত্মক যন্ত্র আলোকরশ্মি স্তম্ভ নিয়ে যেতে চাই। আর বিলম্ব করো না।

কিন্তু এ মেশিন চালক জাফর আলী তো ভয়ানক অসুস্থ। তার দক্ষিণ হাতখানা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

হাঁ, আমি জানি.....চিন্তিত কণ্ঠে বললো বনহুর।

রহমান বললো—সর্দার, আলোকরশ্মি স্তম্ভ চালনা করতে গিয়ে জাফর আলীর শুধু এ অবস্থা হয়নি। বৈজ্ঞানিক মিঃ বার্ডার লর্ডের মৃত্যু ঘটেছে। তার সহকারী মিঃ রবার্টের সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ভস্মীভূত হয়েছে। আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে.......

সব আমি অবগত আছি রহমান, কিন্তু সিন্ধি থেকে হারুন যা জানালো তাতে আলোকরশ্মি স্তম্ভ ছাড়া কোন উপায় নেই।

সর্দার, এ মেশিন চালকগণ যে সব আহত এবং নিহত—তাই বলছিলাম।

আমি নিজে এ মেশিন চালনা জানি, কাজেই কোনো অসুবিধা হবে না রহমান।

নূরী এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো কাঠের পুতুলের মত শক্ত হয়ে, এবার বলে উঠে—না না, আমি তোমাকে ঐ ভয়ঙ্কর মেশিন চালু করতে দেবো না।

নূরী, এটাতে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি নিজে এ মেশিন চালু করতে জানি, কাজেই তুমি চিন্তা করো না।

বনহুরের গম্ভীর স্থির কণ্ঠস্বরে নূরী আর কোনো প্রতিবাদ করতে পারলো না। যেমন দাঁড়িয়েছিলো তেমনি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো বনহুর আর রহমানের কথাগুলো।

বনহুর বললো—রহমান, গোপন সুড়ঙ্গপথে এসব অস্ত্রশস্ত্র এবং আলোকরশ্মি স্তম্ভ সাবধানে জাহাজে উঠিয়ে নাও। আর বাছাই করা সাহসী কয়েকজন অনুচরকেও সঙ্গে নিও, যারা মৃত্যুকে ভয় করে না।

সর্দার, আপনার এমন কোনো অনুচর নেই যে মৃত্যুকে ভয় করে।

সাবাস, তাহলেই হলো। কমপক্ষে চল্লিশজনকে সঙ্গে নিতে হবে।

আচ্ছা সর্দার।

যাও আর বিলম্ব করো না।

রহমান বেরিয়ে যায়।

নূরী বনহুরের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে—আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছো, হুর?

না গিয়ে কোনো উপায় নেই নূরী। তুমি দোয়া করো যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি।

খবরটা পৌঁছে যায় দাইমার কানে।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে দাইমা, বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করতেই বনহুর নূরীকে বাহুমুক্ত করে দিয়ে তাকায় দরজার দিকে।

দাইমা ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠে—হাঁ রে বনহুর, তুই নাকি আজ রাতে সিন্ধি যাত্রা করছিস?

আজ রাতে নয় দাইমা, এক্ষুণি।

মনে মনে শিউরে উঠে বলে দাইমা—আজ যে তোদের বাসর রাত?

বাসর রাতের যাত্রাই শুভযাত্রা। তোমার আশীর্বাদ আমায় রক্ষা করতে হবে দাইমা।

আজ না গেলে হয় না বাবা?

না। এক মুহূর্ত বিলম্ব করা আর সম্ভব নয়, দাইমা।

দাইমা কোনো কথা বলতে পারে না—জানে সে, বনহুরকে আটকানো এখন কোনো শক্তির কাজ নয়। তাই সে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে—আমি তোমাকে কিছুতেই যমদূতের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দেবো না। কিছুতেই না.......

বনহুর ধীর মোলায়েম স্বরে বললো—তুমি অবুঝ নও নূরী। সিন্ধি-ঘাটির অধিনায়ক হারুনের কথাগুলো সব নিজ কানে শুনেছো?

শুনেছি, তাইতো বুক কাঁপছে হুর।

ছিঃ নূরী, তোমার সাজে না এ দুর্বলতা। আমি চাই না তুমি সাধারণ মেয়েদের মত স্বাভাবিক হও।

হুর!

নূরী, জানো আজ সিন্ধিবাসীর সম্মুখে কি চরম দিন। প্রতি মুহূর্তে তারা মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আমার সিন্ধি-ঘাটিতেও সেই ভয়ঙ্কর জীবটা হানা দিয়ে আমার বিশ্বাসী অনুগত দু'জন অনুচরকে হত্যা করেছে। বলো, এ মুহূর্তে আমার কি করা কর্তব্য?

আজ আমাদের শুভদিন।

এই শুভদিনে হাসিমুখে আমাকে বিদায় দাও নূরী। নিজের হাতে তুমি আমাকে সাজিয়ে দাও তোমার মনের মত সাজে। বনহুর নূরীর মুখখানা

তুলে ধরে—হাসো—হাসো নূরী। তোমার হাসিভরা মুখ দেখে আমি যেতে চাই।

নূরীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো, কিন্তু সে হাসি করুণ ব্যথাভরা, গন্ড বেয়ে গড়িয়ে এলো দু'ফোটা অশ্রু।

বনহুর নিজের হাত দিয়ে অশ্রু মুছে দিলো নূরীর গন্ড থেকে। তারপর নিবিড় করে টেনে নিলো ওকে.......

❑

বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে আছে দস্যু বনহুর। দূরে, বহু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছিলো সে। পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন বোরহান আর রহমান। সকলেরই চোখেমুখে একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

দস্যু বনহুরের 'শাহী' জাহাজখানা এখন সিন্ধি নদী অতিক্রম করে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। আকাশ সচ্ছ মেঘমুক্ত, সিন্ধি নদী একেবারে শান্ত-না হলেও বেশ নীরব। সমুদ্রের তীব্র গর্জনের ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচ্ছে, তীর বা কোনো সবুজের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। আকাশে কোনো প্রাণী নেই। তীর থেকে এখন 'শাহী' জাহাজ বহু দূরে সিন্ধি নদীবক্ষে ভাসমান রয়েছে।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে।

সূর্যাস্তের সোনালী আলোয় সিন্ধি নদীর কালো জল যেন আগুন ধরেছে।

বনহুর বাইনোকুলার চোখে লক্ষ্য করছিলো। তার সমস্ত মুখমন্ডলে কঠিন কর্তব্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। বনহুরের দেহে আজ তার দস্যু ড্রেস নয়, সিন্ধি অধিবাসীদের পরিচিত সিন্ধি-নেতা ড্রেস। পরনে লুঙ্গী ধরনের দামী চাদরের মত কাপড়, সম্মুখে কিছুটা উঁচু করে কোমরে জড়ানো। গায়ে ঢিলা পাঞ্জাবী। মাথায় গাঢ় সবুজ রং-এর পাগড়ী।

বনহুর জাহাজে এসে ড্রেস পাল্টে নিয়েছিলো।

আস্তানা থেকে বনহুর তার নিজস্ব দস্যু ড্রেসেই তাজের পিঠে জাহাজ পর্যন্ত এসেছিলো। বনহুর একা নয়, রহমানও ছিলো তার সঙ্গে।

বনহুরের কান্দাই আস্তানার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কান্দুয়া নদী। এ নদীটা কান্দাই বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে ঝাঁম জঙ্গল হয়ে সিন্ধি নদী মুখে, এবং এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা গিয়ে মিলিত হয়েছে বিভিন্ন বড় বড় নদী আর সমুদ্রে।

বনহুরের সবচেয়ে বড় জাহাজখানার নাম হলো 'শাহী'। এ জাহাজ নিয়ে বনহুর সমুদ্রযাত্রা করতো, জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই হতো তার মাঝে

মাঝে। সেই কারণে 'শাহী' তৈরি করা হয়েছিলো অত্যন্ত কৌশলে মজবুত করে। নানারকম অস্ত্রশস্ত্র গোপনে লুকিয়ে রাখার মত প্রচুর জায়গা ছিলো।

এ জাহাজের খোলের মধ্যেই বসানো হয়েছে বনহুরের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র আলোকরশ্মি স্তম্ভ। এই নতুন অস্ত্রটা তৈরি করতে গিয়ে একজন জার্মানী বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু ঘটেছে। কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের জীবন নাশ হয়েছে, আর কয়েকজন শ্রমিকও প্রাণ দিয়েছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তবেই এ অস্ত্র তৈরি সম্ভব হয়েছে বনহুরের ভূগর্ভস্থ আস্তানায়। এ অস্ত্র সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। অত্যন্ত মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা তৈরি হয়েছে এই আলোকরশ্মি স্তম্ভ। দীর্ঘ তিন বছর অবিরত পরিশ্রম করে তবেই এক জার্মানী বৈজ্ঞানিক এ অস্ত্র তৈরি করতে পেরেছেন।

বনহুরের বহু দিনের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। এ অস্ত্র তৈরি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রটি প্রয়োজন হবে, একথা বনহুর বা তার অনুচরগণ কেউ ভাবতে পারেনি। আজ বনহুর এ অস্ত্রটি ব্যবহার করে দেখতে চায়! কিন্তু অস্ত্রটি চালনা করবে বলে বিদেশ থেকে যিনি আগমন করেছিলেন সেই দুর্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক রবার্টের সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ভস্মীভূত হয়েছে।

আজ বনহুর বিপদকালে মিঃ রবার্টকে সঙ্গে নিয়েছে। বনহুর এই ভয়াবহ আলোকরশ্মি স্তম্ভ চালনা সম্পূর্ণভাবে অবগত নয়, হঠাৎ যদি কোনো ভুল হয়ে বসে তাহলে মৃত্যু তার অনিবার্য। কাজেই অসুস্থ রবার্টকে বনহুর এ জাহাজে নিয়েছে, কিন্তু তাঁর যে অবস্থা তাতে বাঁচবেন কি না সন্দেহ আছে। মুখের মাংসপেশীগুলো পুড়ে কুকঁড়ে গেছে। চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের মত, তবে বাম চোখে একটু সামান্য দেখতে পায় অতিকষ্টে। বেচারী রবার্ট মৃত্যুপথের যাত্রী হয়েও সিন্ধী দেশের করুণ অবস্থা এবং সেখানে বনহুরের আগমনের কথা যখন জানলেন তখন বনহুরকে সাহায্য করার জন্য রবার্ট আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি তাদের সঙ্গে সিন্ধী গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

রবার্ট সম্পূর্ণ চলৎশক্তি রহিত বলে তাঁকে ট্রেচারে করে বয়ে নেওয়া হয়েছিলো। জাহাজে ডাক্তার তার চিকিৎসা করছিলেন নিয়মিতভাবে। ঔষধপত্রের কোনো ত্রুটি ছিলো না 'শাহী' জাহাজে। স্বয়ং বনহুর সদা-সর্বদা খোঁজ খবর নিচ্ছিলো তার।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

বনহুর বাইনোকুলারটা রহমানের হাতে দিয়ে বললো—সিন্ধি নদী অতিক্রম করতে আরও ঘন্টাকয়েক লাগবে। সমুদ্রে আমাদের জাহাজ পড়বার আগে আমরা আলোকরশ্মি স্তম্ভ মেশিনটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

সর্দার, কিভাবে আপনি ঐ মেশিন পরীক্ষা করবেন? চারদিকে তো শুধু জল আর জল?

রহমান, এ মেশিন থেকে যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হবে তা শুধু সজীব বস্তুকেই ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না, সমুদ্রের জলরাশিতেও তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে। তারপর ক্যাপ্টেন বোরহানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—চলুন ক্যাপ্টেন, মিঃ রবার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি, জেনে নিতে হবে সব। এসো রহমান।

উপরের একটা ক্যাবিনে মিঃ রবার্টকে রাখা হয়েছিলো।

বনহুর সঙ্গীদ্বয়সহ মিঃ রবার্টের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। দেখলো দু'জন অনুচর তাঁর সেবায় নিয়োজিত আছে। রবার্টের পাশেই বসে আছেন বনহুরের প্রাইভেট ডাক্তার। তাকে বনহুর মিঃ রবার্টের জন্য বিদেশ থেকে এনেছিলো।

বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলো—মিঃ রবার্টের অবস্থা এখন কেমন ডক্টর?

ডক্টর স্মিথ বললেন—পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল মনে হচ্ছে। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

বনহুর মিঃ রবার্টের পাশে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসলো—হ্যালো মিঃ রবার্ট?

মিঃ রবার্টের ব্যান্ডেজ করা দেহটা একটু নড়ে উঠলো, অস্পষ্ট গোঙ্গানির মত একটা শব্দ বেরিয়ে এলো তাঁর মুখমন্ডল থেকে।

বনহুর ঝুঁকে পড়লো অত্যন্ত আপন জনের মতো, যদিও রবার্টের দেহের পঁচা মাংস থেকে ভীষণ গন্ধ বের হচ্ছিলো। শুদ্ধ ইংরেজীতে বললো বনহুর—মিঃ রবার্ট, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন কি? আমি সমুদ্রে পৌছবার পূর্বে আমার আলোকরশ্মি স্তম্ভের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

জড়িত কণ্ঠে বললেন মিঃ রবার্ট—খুব ভাল। আমি তোমাকে সর্বান্তকরণে সাহায্য করবো।

মিঃ রবার্টের কথায় বনহুরের গভীর নীল চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠলো।

জাহাজের সম্মুখস্থ ডেকে এই অদ্ভুত আলোকরশ্মি স্তম্ভ মেশিনটা বসানো হয়েছিলো।

মিঃ রবার্টকে ট্রেচারে করে ডেকে আনা হলো, বনহুর তার পাশে দন্ডায়মান।

রহমান এবং বনহুরের অন্যান্য অনুচর দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলের মুখমন্ডল ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে

উঠেছে। এই অদ্ভুত মেশিনটাকেই তাদের ভয়। কারণ এমন এক রশ্মি এই মেশিন থেকে বিচ্ছুরিত হয় যার সামান্য তাপেও পুড়ে ছাই হয়ে যায় লোহার মত শক্ত জিনিস। এমনকি, সমুদ্রের নোনা পানিতেও নাকি আগুন ধরে যাবে! বনহুর আজ নিজে এই ভয়ঙ্কর মেশিনটা চালু করে পরীক্ষা চালাবে। রহমান এবং বনহুরের অনুচরগণ মনে মনে খোদাকে স্মরণ করছে। তারা নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে সর্দারকে। সর্দারের এতোটুকু অমঙ্গল কামনা তারা কোনোদিন করতে পারে না। আজ তাদের সর্দার যখন সেই যমদূতের মত ভয়ঙ্কর মেশিনটার পাশে এসে দাঁড়ালো তখন সকলের হৃদয় কেঁপে উঠলো মুহূর্তের জন্য।

বনহুর মিঃ রবার্টের মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো—এবার আপনি আমাকে নির্দেশ দিন মিঃ রবার্ট?

জড়িত কণ্ঠে দৃঢ় বলিষ্ঠতার ছাপ ফুটে উঠলো—মেশিন ঠিকমত রাখা হয়েছে তো?

হাঁ, ঠিক আপনার কথামত মেশিন বসানো হয়েছে।

মিঃ রবার্ট বললেন আবার—আলোকরশ্মি স্তম্ভের মুখটা ঠিক জলের দিকে আছে তো? দেখো জাহাজের সামান্য অংশও যেন রশ্মির মুখে না পড়ে। তাহলে জাহাজে আগুন ধরে যাবে।

সব আমি ভালভাবে পরীক্ষা করে নিয়েছি মিঃ রবার্ট। আপনি এবার বলুন কিভাবে কাজ করবো?

আলোকরশ্মি স্তম্ভের নিচে উবু হয়ে দেখবে একটা চাকার মত যন্ত্র আছে। ওটার উপরে যে বোতাম আছে ওটায় চাপ দেবে, সঙ্গে সঙ্গে আলোকরশ্মি স্তম্ভের ডায়নামা চালু হবে কিন্তু দ্রুত বেরিয়ে আসবে না তা হলে তোমার দেহটা চাকার মধ্যে পিষে থেতলে যাবে। সাবধান, এক মিনিট মাত্র সময় পাবে, বুঝলে?

হাঁ, তারপর কি করতে হবে বলুন?

মেশিন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে আলোকরশ্মি স্তম্ভের কাজ শুরু হবে মানে ডায়নামা চলতে থাকবে। এবার তুমি পিছনে যে বড় বড় হ্যান্ডেল আছে তার উপরে সজোরে চাপ দেবে, সঙ্গে সঙ্গে আলোক-রশ্মি স্তম্ভের মিটারে আলোগুলো জ্বলে উঠবে। আলোর বাল্বগুলো জলবে আর নিভবে।

বলুন?

তারপর দ্রুতহস্তে তুমি হ্যান্ডেলের পাশের ইলেকট্রিক সুইচ্ চালু করে দেবে। খুলে যাবে আলোকরশ্মি স্তম্ভের মুখ। তুমি তখন চক্রাকারে হ্যান্ডেলটি ঘুরাতে থাকবে, যে আলোর দ্যুতি বেরিয়ে আসবে তা তখন কাজ করতে থাকবে। সাবধান, এতোটুকু ভুল হলে মৃত্যু অনিবার্য।

মিঃ রবার্ট, এবার আপনি যেতে পারেন। রহমান, একে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।

রহমান এগিয়ে এলো—সর্দার, সব কথা স্মরণ আছে তো?

মিঃ রবার্ট বললেন—হাঁ, ভুলে গেলে সর্বনাশ হবে। আলোকরশ্মির চাকা হঠাৎ যদি ঘুরে যায় তাহলে শুধু তুমিই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে না, সমস্ত জাহাজে আগুন ধরে যাবে।

বনহুর পূর্বের ন্যায় শান্ত কণ্ঠে বললো—ভুল হবে না আশা করি।

মিঃ রবার্ট বললেন—আমাকে এখানে থাকতে দাও

বনহুর বললো—আপনি গেলে আমার কোনো অসুবিধা হবে না মিঃ রবার্ট।

তা হয় না, তুমি জানো না এই আলোকরশ্মি কতখানি মারাত্মক।

জানি—আর জানি বলেই তো আপনাকে এখান থেকে সরে যাবার জন্য বলছি।

তুমি মিথ্যা অনুরোধ করো না বরং আমার ট্রেচারখানা আরও নিকটে রাখো। আমি তো মৃত্যুপথের যাত্রী কিন্তু তোমাকে বাঁচতে হবে। আমার প্রচেষ্টা যেন ব্যর্থ না হয়, আলোকরশ্মি স্তম্ভ যেন তোমার উপকারে আসে।

অগত্যা মিঃ রবার্ট বনহুরের পাশেই রয়ে গেলেন।

বনহুর নির্ভীক সৈনিকের মত আলোকরশ্মি স্তম্ভের নিচে উবু হয়ে প্রবেশ করলো।

রুদ্ধ নিশ্বাসে দূরে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছে বনহুরের বিশ্বস্ত অনুচরগণ। রহমানও দাঁড়িয়ে আছে, না জানি সর্দারের কি অবস্থা হবে—ভয় আর দুর্ভাবনা তাকে বেশ উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

জাহাজখানা এখন নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাপ্টেন বোরহান আছে রহমানের পাশে।

বনহুর আলোকরশ্মি স্তম্ভের মেশিন চালু করে দিয়েই অতি দ্রুত নিচে থেকে বেরিয়ে এলো, তারপর হ্যান্ডেলটা ধরে টেনে দিলো ক্ষিপ্রহস্তে সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের গায়ে কতকগুলো আলো জ্বলে উঠলো, একবার নিভছে আর জ্বলছে। বনহুর মিঃ রবার্টের নির্দেশমত কাজ করে চললো, মিটারের বাল্বগুলোও জ্বলছে আর নিভছে। হ্যান্ডেলের পাশে ১নং সুইচটা টিপে চালু করে দিতেই ভীষণ শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেলো ডেকের উপর।

মিঃ রহমান এবং অন্যান্য অনুচর আর্তনাদ করে উঠলো।

মিঃ রবার্ট ট্রেচারে শুয়েই বুঝতে পারলেন কোনো মারাত্মক ভুল করে বসেছে সে। মিঃ রবার্ট চিৎকার করে বললেন—হ্যান্ডেলের পাশের সুইচ অফ করে দাও, আগুন ধরে গেলো, নচেৎ আগুন ধরে গেলো।

বনহুর সামলে নিলো নিজকে, দ্রুত উঠে মিঃ রবার্টের কথামত হ্যান্ডেলের পাশে ১নং সুইচ অন্ করে দিলো। ভীষণ এক ঝাঁকুনি দিয়ে তীব্র শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো। মিঃ রাবার্ট চিৎকার করে বললেন—৪ নং মেশিন সুইচ টিপে দাও, তারপর ১নং সুইচ টিপে দাও।

বনহুর দ্রুত ৪ নং মেশিন সুইচ টিপে দিয়ে ১নং সুইচ টিপে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে আলোকরশ্মি স্তম্ভ মেশিন খুলে গেলো।

সকলের চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে গেলো যেন মুহূর্তে, সাঁ সাঁ করে একটা শব্দ হতে লাগলো, তার সঙ্গে জাহাজের সম্মুখে ভাসা পানিতে আগুন জ্বলে উঠলো। যতদূর আলোকরশ্মি গিয়ে পড়লো ততদূর পর্যন্ত সিন্ধি নদীবক্ষে আগুন জ্বলছে। সমুদ্রের পানি যেন গলিত লৌহধাতুর মত লাল দেখাচ্ছে। আলোকরশ্মি এতো তীব্র আর তীক্ষ্ণ যে, বনহুরের অনুচরগণ কেউ দাঁড়াতে পারছিলোনা, রশ্মির ঝাঁঝালো আলোতে গায়ে যেন জ্বালা ধরে গেলো। চোখ মেলে চাইতে পারছিলো না। সবাই জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করতে বাধ্য হলো। রহমান তাড়াতাড়ি একটা ড্রামের আড়ালে আত্মগোপন করে ফেললো, সেখান থেকে সে দেখতে লাগলো তার প্রভু দস্যু বনহুরকে। হঠাৎ যদি তার তেমন কিছু হয়ে পড়ে তাহলে সে নিজেও ছুটে গিয়ে আত্মাহুতি দেবে, কিছুতেই এ প্রাণ নিয়ে সে আস্তানায় ফিরে যাবে না।

মিঃ রবার্ট এবার চিৎকার করে উঠলেন—৪নং সুইচ অফ করে দিয়ে ১নং সুইচ্ অফ্ করে দাও.....৪নং সুইচ্ অফ্ করে দিয়ে ১নং সুইচ অফ্ করে দাও......

বনহুর তখন হ্যান্ডেলের চাকা ঘুরিয়ে আলোকরশ্মির তেজ পরীক্ষা করে দেখছিলো, কি ভয়ঙ্কর আর সাংঘাতিক এ রশ্মি!

বনহুর মেশিনের খোলের মধ্যে পিছন অংশে দাঁড়িয়েছিলো কিন্তু চোখ দুটো মেশিনের ছিদ্রপথে, সম্মুখে দেখছিলো সে। মনে হচ্ছে যেন নদীর পানিতে আগুন জ্বলছে।

রবার্টের উচ্চকণ্ঠ বনহুরের কানে পৌছতেই দ্রুত ৪নং মিটারের সুইচ অফ করে দিয়ে ১নং সুইচ অফ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে আলোকরশ্মি নিভে গেলো।

এবার বনহুর দ্রুত হ্যান্ডেলটা টেনে উপরে তুলে দিতেই সাঁ সাঁ শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো। বনহুর এবার মেশিনের নিচে খোলসের মধ্যে প্রবেশ করে আবার হ্যান্ডেলটার সুইচ টিপে অফ করে দিতেই মারাত্মক আলোকরশ্মিস্তম্ভের কাজ বন্ধ হয়ে গেলো।

বেরিয়ে এলো বনহুর মেশিনের ভিতর থেকে।

রহমান নিজকে সংযত রাখতে পারলো না—ছুটে এসে প্রভুকে জড়িয়ে ধরলো—সর্দার!

বনহুর রহমানকে বুকে জড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করলো, এ যে তার জীবনের চরম এক কৃতিত্ব!

জাহাজে তার যতগুলো অনুচর আর কর্মচারী ছিলো সবাই এসে অভিনন্দন জানালো বনহুরকে।

বনহুর ছুটে গেলো এবার রবার্টের পাশে, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো—হ্যালো মিঃ রবার্ট.....হ্যালো মিঃ রবার্ট......

মিঃ রবার্টের গায়ে হাত দিতেই বনহুর স্তব্ধ হয়ে গেলো—মিঃ রবার্টের দেহে প্রাণ নেই, শুধু তাঁর অসাড় দেহটা পড়ে আছে ট্রেচারের উপর।

বনহুর সহসা কথা বলতে পারলো না, তার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'ফোটা অশ্রু।

জাহাজের অনেকেই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, সকলেরই চোখেমুখে উত্তেজনা আর উদ্বিগ্নতার ছাপ। রহমান চলে উঠে—সর্দার, মিঃ রবার্ট কি মারা গেছে?

হাঁ রহমান, মিঃ রবার্ট তাঁর শেষ কাজ সমাধা করে চলে গেছেন। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো বনহুরের গলার আওয়াজ। একটু থেমে বললো বনহুর—মিঃ রবার্ট অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ায় হার্টফেল করেছেন। অবশ্য তিনি আমাকে ঠিকভাবে পরিচালনা না করলে আমার মৃত্যু আজ অনিবার্য ছিলো। আমি ভুল করে ফেলেছিলাম এবং আমার ভুলই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

রহমান চিন্তিত কণ্ঠে বললো—সর্দার, কিন্তু আসল কাজ সমাধা হবার পূর্বেই মিঃ রবার্টের মৃত্যু ঘটলো।

মিঃ রবার্ট তাঁর প্রাণ দিয়েও আমাকে আলোকরশ্মি স্তম্ভ চালু করা শিখিয়ে গেছেন। কাজ সমাধা করেই তিনি বিদায় নিয়েছেন রহমান। কাজেই আমি নিশ্চিন্ত। মিঃ রবার্টের মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করো। কথাগুলো বলে বনহুর মিঃ রবার্টের মৃতদেহের উপর ঝুঁকে তাঁর মুখে চাদর চাপ দিলো।

বনহুরের চোখ দু'টো ছল ছল হয়ে উঠলো, রুমালে চোখ মুছে নিলো সে।

জাহাজ ছাড়বার পূর্বে রবার্টের মৃতদেহ নদীবক্ষে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। গভীর এক বেদনার ছায়া নেমে এলো সকলের মনে। আরও একটা আশঙ্কা সকলকে ভাবিয়ে তুললো। আলোকরশ্মিস্তম্ভ চালনা করতে গিয়ে হঠাৎ যদি তাদের সর্দারের কিছু একটা ঘটে বসে তখন কি হবে।

'শাহী' জাহাজ আবার চলতে শুরু করেছে।

বিরাট জল-জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করে অগ্রসর হলো জাহাজখানা সিন্ধি সমুদ্র অভিমুখে!

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো নূরীর, পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানায়। তার বনহুর কি তবে ফিরে এসেছে? চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো। কই, কক্ষমধ্যে কেউ নেই তো! তবে কে কথা বললো? চমকে উঠলো নূরী—তার গলার লকেটের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে বনহুরের কণ্ঠস্বর....নূরী, এখন আমরা সিন্ধি নদী অতিক্রম করে চলেছি। সিন্ধি নদী অতিক্রম করে আমরা সমুদ্রে পৌঁছবো। আজ আমি আলোকরশ্মি স্তম্ভের আলোকরশ্মি পরীক্ষা কাজে কৃতকার্য লাভ করেছি। দোয়া করো নূরী, যেন সেই ভয়ঙ্কর জীবটাকে হত্যা করতে পারি।

নূরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, দীপ্ত আবেগভরা কণ্ঠে বললো—হুর, তুমি—তুমি কত দূর থেকে কথা বলছো? তোমার কণ্ঠস্বর আমার মনে কি যে আনন্দ দান করছে কি বলবো তোমাকে? তুমি আলোকরশ্মি মেশিন চালনা করে জয়ী হয়েছো, এ যে আমার কত আনন্দ! হুর, বলো কেমন আছো?

আমি এবং আমার অনুচরগণ সবাই ভাল আছি। কিন্তু আমাদের বন্ধু মিঃ রবার্ট মৃত্যুবরণ করেছেন।

বলো কি? কি হয়েছিলো তাঁর?

আলোকরশ্মি স্তম্ভ পরীক্ষা কাজে আমাকে সহায়তা করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। অবশ্য আমাকে বাঁচাতে গিয়েই তাঁকে জীবন দিতে হলো।

উঃ কি সর্বনেশে কথা—না না, তুমি আর ঐ মেশিনে হাত দিও না। তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, তোমাকে আমি অনুরোধ করছি হুর।

নূরী, প্রথমেই বলেছি দোয়া করো যেন জয়ী হতে পারি। বলো খুশি আছ তুমি?

হুর....

নূরী...নূরী....বাইরে কিসের চিৎকার শুনছি। ঐ জীবটা নাকি?

বলো? বলো হুর? হুর...হুর

লকেটে আর কোনো কথা শোনা যায় না, নূরী চেনসহ লকেটখানা চেপে ধরে হাতের তালুতে, ব্যাকুলকণ্ঠে লকেটে মুখ রেখে ডাকে—হুর, হুর...হুর....হুর....নূরী আর কিছু শুনতে পায় না, দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় ভরে উঠে তার মন।

ওদিকে সিন্ধি নদী অতিক্রম করে জাহাজখানা সমুদ্রের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। জাহাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। রাত গভীর। আকাশে চাঁদ না থাকায় নদীবক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছাদিত। জাহাজের সার্চলাইট নদীর জলে এক চক্ষুবিশিষ্ট রাক্ষসের মত আলো ফেলে চলার পথ সচ্ছ করে নিচ্ছিলো।

বনহুর তার ক্যাবিনে বসেছিলো অর্ধশায়িত অবস্থায়। একটু পূর্বেই যে ডেক থেকে ফিরে এসেছে। এতোক্ষণ কয়েকজন সহচরসহ ডেকে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলো। রহমানও ছিলো তার পাশে।

রহমানের অনুরোধেই বনহুর বিশ্রাম গ্রহণ করবার জন্য নিজের ক্যাবিনে এসে শয্যায় বসেছে। মনে পড়লো নূরীর কথা, ওর সঙ্গে আলাপ করার জন্য মনটা হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়লো। পকেট থেকে নতুন সিগারেট-কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। আসলে সিগারেট-কেসটার মধ্যে বসানো আছে অতি ক্ষুদ্রকায় একটি ওয়্যারলেস।

বনহুর সিগারেট পানের অবসরে নূরীর সঙ্গে কথা বলছিলো। এমন সময় বনহুরের ক্যাবিনে লাউড্ স্পীকারে শোনা যায় ক্যাপ্টেন বোরহানের কণ্ঠস্বর—আমাদের জাহাজের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সমুদ্রের মধ্যে একটি কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যার আকৃতি কোনো কচ্ছপের পিঠের মত। বস্তুটি জীবন্ত কোনো জীব তাতে সন্দেহ নেই।

লাউড্ স্পীকারে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত জাহাজময়। বনহুরের জাহাজ 'শাহী'র প্রতিটি ক্যাবিনে ছিলো লাউড্ স্পীকার। ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে লাউড্ স্পীকারে কথা হলে তৎক্ষণাৎ কথাটা সব ক্যাবিনেই শোনা যেতো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সিগারেট কেসের ঢাক্না বন্ধ করে পকেটে রাখলো, তারপর বেরিয়ে এলো দ্রুতগতিতে। সম্মুখ ডেকে এসে দাঁড়ালো, রহমান এবং আরও কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরও এসে পৌঁছলো সেই স্থানে।

জাহাজের সার্চলাইট ছাড়াও একটি পাওয়ারফুল সার্চলাইট ছিলো এ জাহাজে। বনহুর একজন নাবিক অনুচরকে আদেশ করলো সার্চলাইটের সুইচ চালু করে দিতে। বনহুর নিজে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখতে লাগলো। সত্যিই একটা বিরাট গোলাকার চক্চকে বস্তু নজরে পড়লো, জিনিসটা কি যদিও বুঝা যাচ্ছে না তবে সেটা যে ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে সেটা বেশ দেখা গেলো। জাহাজের প্রতিটি প্রাণী বিপুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে। বনহুর হাজার ভোল্টের সার্চলাইটের আলো এবার স্থির করে রেখেছে বস্তুটার উপরে!

ক্যাপ্টেন বোরহানের নির্দেশে জাহাজ থেমে গেছে। এখন 'শাহী' জাহাজ সিন্ধি নদী আর সিন্ধি সমুদ্রের মাঝখানে রয়েছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে জাহাজখানা দোল খাচ্ছে রীতিমত। একটু পূর্বে এমন প্রচন্ড ঢেউ দেখা না সমুদ্রের জলে। হঠাৎ যেন সমুদ্রটা রেগে উঠেছে ভীষণভাবে।

বনহুর সার্চলাইটের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে আলোটা সরিয়ে নিলো বস্তুটার উপর হতে, সঙ্গে সঙ্গে গোলাকার বলটা যেন উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো দ্রুতগতিতে—লম্বা তালগাছের মত একটা দেহ। বোরহান পুনরায় চিৎকার করে উঠলো—সর্দার, আলো ফেলুন, আলো—দেখছেন না আলো সরে যেতেই জীবটা কেমন সজীব হয়ে উঠলো।

বোরহানের কথা কানে যাওয়া মাত্র বনহুর ক্ষিপ্রহস্তে সার্চলাইটের আলো পুনরায় জীবটার উপরে নিক্ষেপ করলো।

বিস্ময়কর ব্যাপার, আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবটা তলিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো।

ক্যাপ্টেন বোরহান বলে উঠলো—সর্দার, এটা সাধারণ জীব নয়, এর নাম কিউকিলা—অতি ভয়ঙ্কর জীব। এর চামড়া গন্ডারের চামড়ার চেয়ে অনেকশত গুণ শক্ত আর কঠিন।

সমস্ত জাহাজে একটা ভীষণ ভয়ার্ত গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেলো। বনহুরের দুঃসাহসী অনুচরগণও এই ভয়ঙ্কর জীবটাকে দেখে চরম ভীত হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো।

রহমান বোরহানের কথায় বলে উঠলো—কিউকিলা? সে আবার কি?

সমুদ্রের রাক্ষস বা দানব এরা। গভীর জলের তলায় ডুবন্ত পাহাড়ের গুহায় এরা লুকিয়ে থাকে। এদের প্রিয় খাদ্য হলো রক্ত। অত্যন্ত ভয়াবহ জীব।

বোরহানের কথা শেষ হতে না হতে জীবটা সম্পূর্ণ তলিয়ে গেলো কিন্তু সেই স্থানের সমুদ্রের পানি যেন তোলপাড় হতে লাগলো। প্রচন্ড ঢেউয়ের উপর বিরাট জাহাজ 'শাহী' মোচার খোলার মত দোল খাচ্ছে যেন।

বনহুর তখনও সেই তরঙ্গায়িত জলরাশির উপর সার্চলাইটের আলো নিক্ষেপ করে চলছে! তার চোখেমুখে একটা কঠিন ব্যক্তিত্বের ছাপ প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বোরহান জাহাজ ছাড়ার জন্য বনহুরের কাছে অনুমতি চাইলো।

বনহুর বললো—ক্যাপ্টেন, আমি এখানে জাহাজ আরও কিছু সময় রাখতে চাই, কারণ জীবটাকে যখন এখানেই আমরা দেখেছি, তখন নিশ্চয়ই তার পুনরায় আবির্ভাব ঘটবে।

ক্যাপ্টেনের চোখেমুখে এক আশঙ্কাজনক ভাব জেগে উঠলো, উত্তেজিত কণ্ঠে বললো—এখানে জাহাজ রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। জীবটা যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের জাহাজ উল্টে ফেলতে পারে, তার অসাধ্য কিছুই নেই।

অন্যান্য অনুচরও ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে বলে মনে হলো। অগত্যা বনহুর জাহাজ ছাড়বার অনুমতি দিলো।

আবার জাহাজ চলতে শুরু করলো।

বনহুর, রহমান ও কিছুসংখ্যক অনুচর মিলে জাহাজের সম্মুখ ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রবক্ষ লক্ষ্য করছিলো। যে স্থানে কিছু পূর্বে সেই ভয়ঙ্কর জীবটার আবির্ভাব ঘটেছিলো সেস্থানে এখন আর কোনো আলোড়ন নেই। জলতরঙ্গ স্থির হয়ে এসেছে।

জাহাজ এখন সমুদ্রবক্ষ অতিক্রম করে সিন্ধি অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। বনহুর এবং তার প্রত্যেকটা অনুচর উদ্বিগ্নভাবে প্রতিক্ষা করতে লাগলো, না জানি আবার কোন্ মুহূর্তে জীবটা হানা দিয়ে বসবে!

বনহুর এবার অদ্ভুত আলোকরশ্মি স্তম্ভ মেশিনটার পাশে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একজন অনুচর হাজার ভোল্টের সার্চলাইটটার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে জাহাজের চারদিকে আলো ফেলে দেখছে। এবার জীবটাকে দেখা গেলেই বনহুর আলোকরশ্মি স্তম্ভ থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত করে ওকে হত্যা করবে।

কিন্তু সমস্ত রাত আর জীবটার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

❑

দু'দিন পর সিন্ধি বন্দরে এসে বনহুরের জাহাজ 'শাহী' নোঙর করলো। সিন্ধিবাসিগণ জানে, এরা সামুদ্রিক দানব কিউকিলা হত্যার জন্যই আগমন করেছে। সিন্ধি সর্দার এসে বনহুরকে অভিনন্দন জানালো।

সিন্ধি ভাষা বনহুরের জানা ছিলো কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না। বনহুর উদ্বিগ্ন সিন্ধি সর্দারকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কিউকিলা হত্যা করে সিন্ধিবাসীদের জীবন রক্ষা করবো।

সেই দিন রাতেই কিউকিলার আবির্ভাব ঘটলো! বনহুর তার ঘাটিতে বিশ্রাম করছিলো, সিন্ধি সর্দার ও তার দলবল ছুটে এলো বনহুরের ঘাটিতে। বনহুরকে তারা দেবতার মত মনে করতো, কারণ বনহুর সিন্ধিবাসীদের মধ্যে এসে অর্থ দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, বিপদ-গ্রস্তদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে। তাই সিন্ধিবাসিগণ তাকে 'দেবরাজ' বলে সম্বোধন করে থাকে।

সিন্ধি সর্দার দলবল নিয়ে ভয়-বিহবল উদ্বিগ্নভাবে হাজির হলো বনহুরের সিন্ধি ঘাটিতে।

বনহুর তখন বিশ্রাম করছিলো।

সিন্ধি সর্দার দলবল নিয়ে ঘাটিতে উপস্থিত হয়ে সিন্ধি ভাষায় বললো—দেবরাজ, দেবরাজ—বাঁচাও, বাঁচাও, আবার সেই জলদানব হানা দিয়েছে। বাঁচাও দেবরাজ, বাঁচাও আমাদের সবাইকে।

বনহুর সিন্ধিবাসীদের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলো না, বিশ্রাম ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো ঘাটির বাইরে। দেখলো অগণিত সিন্ধিবাসীসহ সিন্ধি সর্দার এসে উপস্থিত হয়েছে। সকলেরই হাতে এক একটি মারাত্মক অস্ত্র, বশাক্ত বল্লম, তীর-ধনু, বর্শা, বন্দুক, রাইফেল লাঠিসোটা—যে যা পেয়েছে নিয়ে হাজির হয়েছে।

বনহুর সর্দারের মুখে শুনলো, সমুদ্র থেকে কিউকিলা উঠে সিন্ধি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং কয়েকজনকে হত্যা করে রক্ত শুষে নিয়েছে।

যে অঞ্চলে কিউকিলা আগমন করেছে সেই অঞ্চলে বনহুর সিন্ধি সর্দার এবং লোকজনের সঙ্গে গমন করলো। সঙ্গে রয়েছে রহমান ও আরও অনেকে। আলোকরশ্মি স্তম্ভটা সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়, তবু বনহুর ট্রাকটরের মধ্যে বসিয়ে নিয়েছে ওটাকে। অতি সাবধানে বহু কষ্টে ওটাকে ট্রাকটরের মধ্যে বসানো সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু ট্রাকটর চালিয়ে সব জায়গায় নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ট্রাকটর তবু পথঘাট বনজঙ্গল মাড়িয়ে এগুতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বনহুরের দল, যেমন করে হোক কিউকিলাকে ধ্বংস করতেই হবে।

কিন্তু যেখানে কিউকিলার উপদ্রবের কথা শুনতে পাচ্ছে সেখানে গিয়েই নিরাশ হচ্ছে বনহুর ও তার দলবল। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই কিউকিলা সে স্থান চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সরে পড়েছে। এক বীভৎস লীলার ধ্বংসস্তূপ শুধু পড়ে রয়েছে। ক্ষত-বিক্ষত নরদেহ আর অগণিত বাড়িঘর ও গাছপালার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না তারা। এসব লক্ষ্য করে বনহুর বুঝতে পারলো, জীবটা শুধু ভয়ঙ্করই নয়, বিরাট আকার হবে। যার দেহভারে বড় বড় দালান-কোঠা, গাড়ি-ঘোড়া পিষে থেতলে গেছে।

আরও একটা জিনিস বনহুর লক্ষ্য করলো, শুধু মানুষের রক্তই জীবটা শুষে নেয়নি, যে কোনো জীবকে সম্মুখে পেয়েছে তারই বুকের রক্ত নিংড়ে খেয়েছে। একটা বিরাট অশ্বের মৃতদেহ নজরে পড়লো বনহুরের, দেখলো অশ্বটার বুকের কাছে মস্তবড় একটা ক্ষত, ক্ষতটা ঠিক থেতলানো তাল ছোবড়ার মত। বনহুর এ পর্যন্ত যে কয়টি কিউকিলার দ্বারা নিহত জীব লক্ষ্য

করেছে প্রত্যেকটা জীবের বুকের কাছে ঐ একই ধরনের ক্ষত লক্ষ্য করেছে। কিউকিলা যেন চিবিয়ে চুষে রক্ত পান করে নিয়েছে।

বনহুর দেখলো, দলবল নিয়ে কিউকিলার পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে প্রচুর বিলম্ব হয়ে পড়ছে। জীবটা ততক্ষণে দ্রুত সরে যাচ্ছে দূরে—অনেক দূর। কিছুতেই জীবটাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না।

বনহুর কিউকিলা হত্যার জন্য তার মারাত্মক অস্ত্র আলোকরশ্মি স্তম্ভসহ ট্রাকটর নিয়ে একাই এগুলো, সে নিজে ট্রাকটর চালনা করতে লাগলো। রহমান দলবল নিয়ে অগ্রসর হলো বিপরীত পথে।

রহমানের সঙ্গে ঝাঁমবীর পুরুষগণ এগুলো।

আর ঝাঁম সর্দার রইলো বনহুরের ট্রাক্‌টরের উপরে। বন-জঙ্গল অতিক্রম করে বনহুরের ট্রাকটর এগুচ্ছে।

রহমান ঝাঁমবীর পুরুষদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অন্য পথে অগ্রসর হচ্ছে। রহমানের হাতে ছোট্ট ওয়্যারলেস, বনহুরের সঙ্গে সর্বক্ষণ সে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। কখন কোন্ পথে গেলে জীবটাকে পাওয়া যেতে পারে এসব নিয়েই ওয়্যারলেসে কথা হচ্ছিলো।

রহমানের দল পায়ে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছে কাজেই তারা কিউকিলার চলার পথ সহজেই আবিষ্কার করে নিচ্ছে এবং সেইভাবে বনহুর ঝাঁম সর্দারকে নির্দেশ দিচ্ছে।

বনহুরের পিঠে বাঁধা রাইফেলের সঙ্গে ওয়্যারলেস বসানো ছিলো, রহমান যা বলছে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে এবং সেইভাবে এগুচ্ছে।

হঠাৎ ওয়্যারলেসে শুনতে পেলো বনহুর....সর্দার, ঝাঁম-কাটোরা জঙ্গলের দিকে কিউকিলা এগিয়ে যাচ্ছে—সর্দার, সাবধান, কিউকিলা টের পেয়েছে—লোকজন তার পিছনে ছুটছে, এটা সে বেশ অনুভব করেছে।

বনহুর ঝাঁম সর্দারকে বললো—কাটোয়া জঙ্গলপথ দেখিয়ে দাও।

ঝাঁম সর্দার পথ দেখিয়ে দিতে লাগলো।

সেইপথে ট্রাকটর বন বাদাড় ভেঙ্গে ছুটে চলেছে। বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছে ঝাঁম সর্দার।

হঠাৎ ঝাঁম সর্দার উচ্চকণ্ঠে বলে উঠে—দেবরাজ, দেবরাজ, দেখুন, সম্মুখে তাকিয়ে দেখুন.....

বনহুর সামনে তাকিয়ে দেখতেই বিস্মিত হলো, অদূরে গাছপালার উপর দিয়ে একটা বিরাট দেহসহ মাথা নজরে পড়লো। যেন একটা জমকালো চক্‌চকে কভারে ঢাকা তালগাছ, মাথাটা ঠিক জ্বালার মত। মাথায় কোনো চুল বা লোম নেই, দেহটাও অত্যন্ত মসৃণ আর জমাট বলে

মনে হলো। একটা মহিষ হাতে উঠিয়ে নিয়ে মুখের কাছে ধরে আছে, মহিষটা তখনও পা নড়াচ্ছে, ছটফট করছে যন্ত্রণায়।

ঝাঁম সর্দার বললো—দেবরাজ, এ সময় জলদানবটা মহিষের রক্ত-পানে ব্যস্ত আছে, এটাই তাকে হত্যা করার একটা প্রধান সুযোগ।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে আলোকরশ্মি স্তম্ভ চালু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো, ওয়্যারলেসে রহমানকে জানালো....রহমান, কিউকিলার নিকটে পৌঁছে গেছি, আমি আলোকরশ্মি স্তম্ভ চালু করে কিউকিলা হত্যার চেষ্টা নিচ্ছি, তোমরা এদিকে চলে এসো, তোমাদের সাহায্য দরকার হতে পারে।

রহমান জবাব দিলো....এক্ষুণি আমরা আসছি সর্দার। আপনি সাবধানে আলোকরশ্মি স্তম্ভ চালু করবেন, কোনো বিপদ যেন না ঘটে।

বনহুর আলোকরশ্মি স্তম্ভের নিচে প্রবেশ করে চক্রাকারে যন্ত্রটার বোতাম টিপে ধরলো—অমনি প্রচন্ড শব্দ হলো, বনহুর দ্রুত বেরিয়ে এসে হ্যান্ডেলটা নিচে নামিয়ে দিতেই মেশিনের গায়ে আলোগুলো জ্বলে উঠলো। মিটারের আলোগুলো জ্বলছে আর নিভছে। মুহূর্ত বিলম্ব করলো না সে, ৪নং সুইচ অন্ করে ১নং বোতাম টিপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে আলোকস্তম্ভের মুখ জ্বলে গেলো।

বনহুর দক্ষিণ হস্তে হ্যান্ডেল ধরে বামহস্তে ঝাঁম সর্দারকে টেনে নিলো দ্রুত নিজের পাশে। আর এক দন্ড বিলম্ব হলেই ঝাঁম সর্দারের মৃত্যু ঘটতো নিঃসন্দেহে।

বনহুর তার মারাত্মক আলোকরশ্মি স্তম্ভের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে আলো ফেললো কিউকিলার বিরাট জমকালো কঠিন দেহটা লক্ষ্য করে। বিস্ময়কর ব্যাপার, যেদিক দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবাহিত হলো দেখতে দেখতেই সেইদিকের বনভূমির বৃক্ষ-লতা-পাতা সব যেন যাদুমন্ত্রের মত গলে মুচড়ে নেতিয়ে পড়লো। আগুন না ধরলেও গাছপালাগুলো যেন পুড়ে গেলো নাইট্রিক এসিড দেয় বস্তুর মত। কিন্তু আশ্চর্য কান্ড, এখনও জলদানব কিউকিলা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। একবার এদিকে ফিরে হাতের গলিত মাংসপিন্ডটা ফেলে দিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে চললো সম্মুখের দিকে।

কিউকিলার হাতের মহিষটা আলোকস্তম্ভের মারাত্মক রশ্মিতে গলে মাংসপিণ্ড হয়ে পড়েছে। কিউকিলার শরীরে রশ্মি পড়তেই একবার এদিকে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করলো, তারপর দ্রুত সম্মুখে এগিয়ে চললো কিউকিলা। মারাত্মক আলোকরশ্মি তার দেহে যেন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারলো না।

বনহুর দ্রুতহস্তে আলোকরশ্মি স্তম্ভের মেশিন অফ করে দিলো। তারপর ট্রাকটরে ষ্টার্ট দিলো, ডবল স্পীডে ছুটতে লাগলো ট্রাকটরখানা। ওয়্যারলেস

চালু করাই ছিলো, সে বলে চললো....রহমান, আশ্চর্য! মারাত্মক আলোকরশ্মি তেজে বনভূমির বৃক্ষ-লতা-পাতা গলে গেছে, কিন্তু জলদানবের দেহে এতটুকু আঁচ লাগেনি। সে ক্ষিপ্রগতিতে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঝাঁম সর্দারও কম আশ্চর্য হয়নি, এমন একটা ভয়ানক রশ্মির মারাত্মক তেজ কিউকিলাকে কিছু করতে সক্ষম হলো না। ঝাঁম সর্দারের মুখের কথা যেন লোপ পেয়ে গেছে, আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে একেবারে। আজ সে এমন অদ্ভুত আর বিস্ময় কান্ড দেখতে পেলো যা সে কোনোদিন দেখেনি বা শোনেনি এমন কথা।

ওদিক থেকে ওয়্যারলেসে ভেসে এলো....সর্দার, আমরা দূর থেকে লক্ষ্য করছি, আলোকরশ্মি কিউকিলার দেহে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারলেও সে বেশ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে এবং সমুদ্রের দিকে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে।

বনহুর বললো—তোমাদের সীমানার মধ্যে এলে তোমরা মেশিন চালাবে। যে যা পারো তার উপর অস্ত্র প্রয়োগ করবে।

রহমানের কণ্ঠ শোনা গেলো ওয়্যারলেসে—মেশিনগান চালানো সম্ভব নয়, আমরা কামান নিয়ে গহন বনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে আছি।

মেশিনগান চালাতে হলে কিউকিলার আরও নিকটে সরে আসার প্রয়োজন কিন্তু সে সাহস কেউ পাচ্ছে না। সর্দার, আপনি আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করে কিউকিলাকে নিহত করতে পারলেন না, মেশিনগান বা কামানের গোলাও তাকে কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। সর্দার, সমুদ্রের দিকে কিউকিলা দ্রুত চলে যাচ্ছে।

হাঁ, আমি তার প্রায় একশত গজ দূরে রয়েছি। তার মাথা এবং অর্ধেক শরীর দেখা যাচ্ছে। ঝাঁম সর্দারের অবস্থা বড় সঙ্কটময়, সে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে। কিউকিলার আর আলোকরশ্মি স্তম্ভ তাকে বিস্ময়াহত করে তুলেছে। রহমান, কিউকিলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে, আমি আলোকরশ্মি স্তম্ভ চালু করবো, সম্মুখ জঙ্গল থেকে দূরে চলে যাও। দূরে চলে যাও......

সঙ্গে সঙ্গে রহমানের ভীত আর্তনাদ শোনা যায়.....কিউকিলা আমাদের দেখে ফেলেছে, সর্দার, আমরা মারা পড়লাম....সর্দার, কিউকিলা আমাদের দেখে ফেলেছে......

বনহুর আলোকরশ্মি স্তম্ভ চালু করতে পারছে না কারণ তাদের সম্মুখে বনাঞ্চলের মধ্যেই রয়েছে রহমান দলবল নিয়ে। কিন্তু কিউকিলার গতিরোধ করার কি উপায় আছে।

বনহুর আলোক স্তম্ভের হেডলাইট খুলে দিলো, অত্যন্ত পাওয়ারফুল সার্চলাইট। আলো ফেললো কিউকিলার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে জলদানব

রহমানের দলের একজনকে ধরে ফেলেছে এবং নিশ্চিন্ত মনে তার বুকে দাঁত বসিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে।

বনহুর সার্চলাইটের আলো ফেললো, বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখলো, লোকটাকে ধনুকের মত বাঁকা করে বুকের কাছে কামড়ে ধরে আছে কিউকিলা, বোধ হয় রক্ত খাচ্ছে। শিউরে উঠলো বনহুরের শরীর। ঝাঁম সর্দার বললো—দেবরাজ, কিউকিলাকে কেউ মারতে পারবে না, এখন কি হবে দেবরাজ? এখন কি উপায়ে দেশবাসীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে!

বনহুরের সার্চলাইটের তীব্র আলোকরশ্মিতে বেশিক্ষণ কিউকিলা দাঁড়াতে পারলো না, সে দ্রুত সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!

রহমান তার দলবল নিয়ে বিপরীত পথে ছুটে পালাচ্ছে। বনহুর ক্ষান্ত হলো না, সে আলোকস্তম্ভসহ ট্রাকটর নিয়ে বন-বাদাড় ভেঙ্গে সম্মুখে এগুচ্ছে।

সমুদ্রের অতি নিকটে পৌঁছে গেছে প্রায় কিউকিলা।

বনহুরের ট্রাকটর থেমে পড়লো, বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ট্রাকটরের উপরে দাঁড়িয়ে দেখছে বনহুর। কিউকিলা ঠিক একটি স্নানরত মানুষের মত সমুদ্রের মধ্যে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে, সচ্ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে সামনের দিকে। সমুদ্রের জলে যতই এগুচ্ছে ততই কিউকিলার বুক অবধি জল এবার ঝুপ করে মাথাটা নিচু করে নিলো। সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে এবার কিউকিলা।

কিন্তু আশ্চর্য! কিউকিলা তলিয়ে যাবার পর সমুদ্রের জলে ভীষণ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো, যেন কোনো মেশিন দ্বারা সমুদ্রের জলকে তোলপাড় করা হচ্ছে।

কিউকিলাকে মারাত্মক আলোকরশ্মিও যখন কাবু করতে পারলো না তখন সকলের মনে একটা ভীষণ দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

ফিরে এলো বনহুর ট্রাকটরসহ সিন্ধিঘাটিতে।

ঝাঁম সর্দারের সঙ্গে চললো তার নানারকম পরামর্শ। রহমান ও তার দলবল সবাই যোগ দিলো এ আলোচনায়।

সেইদিনই ঝাঁম রাজ্যের রাজা হেমন্ত সিন্ধু ডেকে পাঠালেন বনহুর ও ঝাঁম সর্দারকে। মোহন্ত সিন্ধুর প্রধান সেনাপতি স্বয়ং ঝাঁম সর্দারকে অনুরোধ জানালো এবং রাজার আদেশ বর্ণনা করে শোনালো।

ঝাঁম সর্দার মহারাজার আদেশ অমান্য করতে সাহসী হলো না, রাজার হলেও মোহন্ত সিন্ধু দেশের রাজা আর সে ঝাঁম জঙ্গলের অধিপতি জংলীদের সর্দার।

বনহুরকে নিয়ে মহারাজ মোহন্ত সিন্দুর রাজদরবারে হাজির হলো।

ঝাঁম দেশের রাজা বনহুর আর ঝাঁম সর্দারকে সাদরে অভিনন্দন জানালেন। সসম্মানে বসালেন নিজের আসনের পাশে। মোহন্ত সিন্দু বনহুরের কার্যকলাপের কথা লোকমুখে শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন। তিনি জানতে পেরেছেন, দেবরাজ নামক একটি যুবক তাদের দেশে আগমন করে কিউকিলা হত্যার চেষ্টা করছে। কিউকিলা এক সাংঘাতিক জীব, সেই জীবটা তাদের দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কিছুদিন হলো কিউকিলা বা জলদানবটির আবির্ভাব ঘটেছে, সে প্রায়ই সমুদ্র হতে এসে ঝাঁম শহরে এবং গ্রামঞ্চলে হানা দিয়ে বহু জীবন ধ্বংস করেছে। কেউ তাকে হত্যা করতে পারছে না। এমন একটা জীবকে হত্যার দুঃসাহস কম কথা নয়। মহারাজ মোহন্ত সিন্দু তাই দেবরাজ নামক বীর পুরুষটিকে ডেকে এনেছেন স্বচক্ষে দেখবার উদ্দেশ্যে।

মহারাজ সিন্দু দেবরাজকে দেখে শুধু মুগ্ধই হলেন না, অবাক হলেন তার অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করে। আবেগভরা কণ্ঠে বললেন মহারাজ—দেবরাজ, সত্যিই তুমি অদ্ভুত মানুষ। দেবরাজ, তুমি যদি এই ভীষণ জীবটাকে নিহত করে ঝাঁমবাসিগণকে উদ্ধার করতে সক্ষম হও তবে আমি আমার কন্যা কুমারী মালাকে তোমায় উপহার দেবো। আর দেবো আমার ঝাঁম রাজ্যের সাগরতলের রাজপ্রাসাদটি।

অবাক হলো বনহুর, বললো—ঝাঁম রাজ্যের সাগরতলের রাজ-প্রাসাদ—সে আবার কি?

মহারাজ বললো—আমার বড় দাদা এই প্রাসাদটি অতি সখ করে গভীর সাগরতলে তৈরি করেছিলেন। এটা তৈরি করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিলো বড় দাদার। তার কন্যা সিন্ধির রাণীর জন্যই পাতালপুরীতে তিনি এ প্রাসাদ গড়েছিলেন।

চমকে উঠলো বনহুর—সিন্ধিরাণী! সে তো তার অতি পরিচিত এক নাম। এবার সব স্পষ্ট বুঝতে পারলো, সাগরতলে সেই সুন্দরীদের কুমারী সিন্ধিরাণী, যে তাকে ভালবেসেছিলো একদিন গভীরভাবে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটেছিলো সিন্ধিরাণীর।

মহারাজ বলে চলেছেন—দাদাকে হত্যা করে এক দুষ্ট ডাকাত, তারপর তার একমাত্র কন্যা সিন্ধিরাণীকে হরণ করে এবং সাগরতলে তাকে নিয়ে বসবাস করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিন্ধিরাণীর মৃত্যু হয়—কে বা কারা সিন্ধিরাণীকে নিহত করে। সাগরতলের প্রাসাদ এখন আমার দখলে। থামলেন মহারাজ—তারপর আবার শুরু করলেন—আমার একমাত্র কন্যা মালার জন্যই আমি সাগরতলের প্রাসাদটি পুনরায় নতুনভাবে মেরামত করছি। দেবরাজ, তোমাকে দেখে আমি সত্যিই অত্যন্ত খুশি আর মুগ্ধ

হয়েছি, তুমি কিউকিলাকে হত্যা করে আমার এ সামান্য উপহার গ্রহণ করবে আশা করি।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে হাসলো।

ঝাঁম সর্দার বনহুরের হয়ে বললো—দেবরাজ, আপনার উপহার সানন্দে গ্রহণ করবে মহারাজ।

বেশ, আমি নিশ্চিন্ত রইলাম। বনহুরের সাথে করমর্দন করে আবার বললেন মহারাজ—কিউকিলা হত্যার জন্য যা প্রয়োজন আমাকে জানালেই পাবে। আমি নিজেও তোমাকে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবো।

বনহুরের সঙ্গে ঝাঁম অধিপতি এতোক্ষণ ঝাঁম ভাষায় কথাবার্তা বলছিলেন। বনহুরও ঝাঁম ভাষাতেই উত্তর দিচ্ছিলো।

সাগরতলের প্রাসাদের লোভ বনহুরের মনে এক নতুন উদ্যমের সৃষ্টি করে, তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা সাগরতলে একটি আস্তানা গড়ে তুলবে—হয় তো সে আশা তার পূর্ণ হবে এবার কিন্তু রাজকুমারী মালা—মালাকে নিয়ে সে কি করবে?

মহারাজের আদেশে মালাকে আনা হলো রাজদরবারে।

বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো ঝাঁম রাজকুমারী, সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না বনহুর। ঝাঁম রাজকুমারীর সৌন্দর্য তাকে মোহগ্রস্ত করলো কিন্তু বেশিক্ষণ মালাকে নিয়ে ভাববার সময় কই তার।

বনহুর আর ঝাঁম সর্দার মহারাজ মোহন্ত সিন্ধুর নিকটে বিদায় নিয়ে চলে এলো ঘাটিতে। কিভাবে এই ভয়ঙ্কর জীবটাকে হত্যা করবে, এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। হঠাৎ মনে পড়লো, কিউকিলা যখন সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিলো তখন সমুদ্রবক্ষে যেন তোলপাড় শুরু হয়েছিলো। বনহুরের মনে বিস্ময় জেগেছিলো—জীবটা তলিয়ে যাওয়ার পর সেখানে সমুদ্রের জলে অমন অদ্ভুত জলতরঙ্গের সৃষ্টি হলো কেন?

এই প্রশ্নটা আরও বেশি উদ্বিগ্ন করে তুললো বনহুরকে, নিশ্চয়ই জীবটার পিছনে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।

❑

কয়েকদিন কিউকিলার আবির্ভাব আর হয় না! বনহুর অনেকটা নিশ্চিন্ত, ঝাঁম অধিবাসিগণের মনেও বেশ শান্তি এসেছে তবে কেউ সম্পূর্ণ আশ্বস্ত নয়। কখন কোন্ মুহূর্তে আবার সেই জলদানব হানা দেবে তার ঠিক নেই।

বনহুর যখন ঝাঁম দেশে জলদানব কিউকিলাকে নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন নূরী বনহুরের জন্য দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছে। আজকাল প্রায়ই

নূরী তার লকেটের ঢাকনা খুলে ক্ষুদে ওয়্যারলেস নিয়ে বনহুরের খোঁজখবর নেয়।

নূরীর জেদে বনহুর নিজের বাজুতে একটা বাজুবন্দের মধ্যেও ওয়্যারলেস রাখতে বাধ্য হয়েছে। নূরী যেন তার লকেটের ঢাকনা খুললেই জানতে পারে তার বনহুর কখন কি করছে বা কখন কেমন অবস্থায় আছে।

বনহুর যখন ঘুমাতো তখন তার নাসিকাধ্বনিও নূরীর মনে জাগাতো অফুরন্ত এক উন্মাদনা—সে মনে করতো, তার হুর বুঝি পাশেই আছে। বনহুর যখন কথা বলতো তার কণ্ঠস্বর নূরীর হৃদয়ে যোগাতো অসীম আনন্দ।

গভীর রাতেও বনহুর আর নূরীর মধ্যে চলতো কথাবার্তা যেন পাশাপাশি দু'জন বসে বসে আলাপ করছে।

বনহুরের বাজুতে বাঁধা বাজুবন্দে ওয়্যারলেস বসানো আছে, এ কথা জানতো না তার দলের কেউ, এমন কি রহমানও জানতো না এ কথা।

রহমানের সঙ্গে যখন বনহুরের নিভৃতে আলাপ হতো তখন নূরী সব শুনতো কান্দাই আস্তানায় বসে বসে।

বনহুর জানিয়েছে, এখন বেশ কয়েক দিন হলো কিউকিলার আবির্ভাব ঘটেনি, তাই তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত। ঝাঁমবাসিগণের মনেও কতকটা স্বস্তি এসেছে। বনহুর নূরীর কাছে ঝাঁমদেশের সবকথাই প্রায় জানিয়েছে, শুধু জানায়নি কিউকিলা হত্যা করতে সক্ষম হলো ঝাঁমরাজ তাকে সাগরতলের রাজপ্রাসাদ আর তার কন্যা মালাকে উপহার দেবেন। বনহুর জানে, এ কথা শুনলে নূরীর অভিমানী মন ব্যথায় গুমড়ে উঠবে, বিশেষ করে ঝাঁমরাজ কন্যা মালার কথাটা তাকে না জানানোই ভাল।

বনহুর ঝাঁমরাজ কন্যা মালাকে মনে স্থান না দিলেও মালার মনে বনহুর গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো। সেদিন ওকে দেখার পর থেকে সর্বক্ষণ হৃদয়ে একটা আলোড়ন অনুভব করে চলেছে মালা!

একদিন মালা কয়েকজন ঝাঁমবাসিনী সখীকে সঙ্গে করে তার কাছে এসে হাজির হলো।

বনহুর তখন ঝাঁম সর্দারের আসরে বসে কিউকিলা নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলো। রাজকন্যা মালার আগমনে ঝাঁম সর্দার বিস্মিত হলো, তাকে অভিনন্দন জানালো নত মস্তকে।

মালা ইংগিত করলো সবাইকে চলে যেতে।

ঝাঁম সর্দার তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলো পুনরায় অভিবাদন করে।

মালা সখীদের নিয়ে ঘিরে ধরলো বনহুরকে।

বনহুর প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি, বুঝলো এক মুহূর্ত পরে।

মালা অতি পরিচিতের মত বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা হাতে তুলে নিলো, ঝাঁম ভাষায় বললো—প্রিয়, সেদিন তোমাকে দেখার পর থেকে আমি তোমাকে একদন্ডের জন্য ভুলতে পারিনি। কিউকিলা হত্যা করতে গিয়ে যদি তোমার কোনো বিপদ ঘটে তাহলে আমিও মৃত্যুবরণ করবো।

মালার কথা শুনে বনহুর একেবারে থ' বনে গিয়েছে, কোনো কথা সহসা তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না।

সখীরা হেসে উঠলো খিল খিল করে।

বনহুর নিজের বাজুবন্দের ওয়্যারলেসে হাতচাপা দিলো। হয়তো নূরী এ সময় সব শুনে ফেলতে পারে।

বললো বনহুর—কিউকিলা হত্যা করতে গিয়ে আমার মৃত্যু ঘটলে তুমি মৃত্যু বরণ করবে, এটা নেহাৎ ভুল করবে মালা। কারণ আমি বিদেশী...

বনহুরকে কথা শেষ করতে দেয় না মালা, বলে সে তুমি বিদেশী বলেই তো আমি তোমাকে নিজের মত করে পেতে চাই দেবরাজ। আমাদের ঝাঁম দেশে একটি লোকও তোমার মত নয়।

বনহুরের চোখেমুখে বিস্ময় জেগে উঠে, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে মালার মুখের দিকে।

সখীরা বেরিয়ে যায়, কিছু বুঝতে পারে না তারা মনে মনে।

মালা বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে, তখনও বনহুরের হাতখানা তার হাতের মধ্যে। আবেগভরা কণ্ঠে বলে মালা—দেবরাজ, কিউকিলা হত্যা করতে আমি নিজে তোমাকে সাহায্য করবো।

আমি খুশি হবো তোমার সাহায্য পেলে...

চমকে উঠে বনহুর, নূরীর কণ্ঠ শোনা যায়—হুর, তোমার পাশে কোনো নারী কথা বলছে? কে সে শীঘ্র জানাও?

বনহুর চমকে উঠলেও ঘাবড়ায় না—কারণ সে জানে, নূরী ঝাঁম ভাষা বুঝতে পারবে না, আর মালাও বুঝতে পারবে না বাংলা ভাষা। কতকটা আশ্বস্ত হলো বনহুর, বললো—নূরী, যে যুবতী আমার সঙ্গে কথা বলছে সে একজন ঝাঁমবাসিনী। তার ছেলেকে কিউকিলা ধরে নিয়ে গেছে তাই সে...

বনহুরের কথা শেষ হয় না, নূরীর কণ্ঠ শোনা যায় আবার—আমাকে তুমি মিথ্যা কথা বলছো হুর? যে যুবতী তোমার পাশে রয়েছে তার কথা

আমি বুঝতে না পারলেও এটুকু আমি বুঝতে পারছি, সে কোনো বিপদের কথা নিয়ে তোমার কাছে আসেনি। তার কণ্ঠস্বর বিপদগ্রস্ত মহিলার নয়....

হেসে উঠে বনহুর ভীষণ জোরে—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ.....তারপর হাসি থামিয়ে বলে—নূরী, এতো সুচতুরা মেয়ে তুমি! যাক্, তুমি বিশ্বাস করো আমাকে নূরী, যার সঙ্গে এখন আমি কথা বলছি সে ঝাঁম রাজার কন্যা মালা। কিউকিলা হত্যা করতে সক্ষম হলে ঝাঁমরাজা আমাকে তাঁর সাগরতলের রাজপ্রাসাদ আর রাজকন্যা মালাকে উপহার দেবেন....বলো তুমি রাজি আছো এ উপহার গ্রহণে?

নূরীর অভিমানভরা কণ্ঠ—তোমার যা ভালো লাগে তাই করো কিন্তু কিউকিলা হত্যা করা সহজ হবে বলে মনে হয় না। হুর, তুমি ফিরে এসো। তুমি ফিরে এসো হুর......

এমন একটা মুহূর্তে আমি পৌঁছেছি নূরী যেখান থেকে ফেরা সহজ কথা নয়। কিউকিলাকে হত্যা না করে আমি দেশে ফিরবো না......

তবে আমাকে তোমার পাশে যাবার অনুমতি দাও হুর......

নূরী, যে কথা তুমি বলছো তা সম্ভব নয়। তুমি আমাকে সব সময় বিশ্বাস কর। শুধু মালা কেন, শত মালা এলেও তোমার হুর ঠিক তোমারই থাকবে।

হুর...আমার হুর....

বনহুরকে এভাবে আপনা আপনি কথা বলতে দেখে মালা বিস্মিত হতবাক হয়ে পড়েছিলো, কোথা থেকে ভেসে আসছে একটা নারীকণ্ঠ সে কিছু বুঝতে পারছিলো না। তাই সে অবাক হয়ে শুনছিলো এতোক্ষণ। একবার বলে উঠে—দেবরাজ, কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো?

বনহুর বললো—আমার স্ত্রী নূরীর সঙ্গে।

বনহুর ভেবেছিলো, স্ত্রীর কথা বললে হয়তো মালার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখবে কিন্তু আশ্চর্য, মালার ভিতরে এতোটুকু পার্থক্য দেখা গেলো না, সে পূর্বের মত হাসিভরা মুখে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

বনহুরের কাঁধে মাথা রাখলো মালা।

বনহুর অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলো, তাড়াতাড়ি বাজুবন্ধ খুলে চাপ দিয়ে রাখলো হাতের মুঠায়। মালা যে এমনভাবে তাকে পেয়ে বসবে ভাবতে পারেনি। সখীদের বিদায় দিয়ে সে দেবরাজকে নিয়ে মেতে উঠলো যেন।

দেবরাজ উঠে দাঁড়ালো—মালা, তুমি যাও; আমি একসময় দেখা করবো তোমার সঙ্গে।

মালা বললো—না, তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি দিলো মালা।

সঙ্গে সঙ্গে সখীরা এসে আবার ঘিরে দাঁড়ালো বনহুর আর মালাকে।

মালা ইংগিত করলো সখীদের।

সখীরা অমনি বনহুরকে এসে ধরলো।

মালা বললো—নিয়ে চলো একে বন্দী করে।

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর—আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে? কিউকিলা হত্যা করবে তাহলে কে?

চলো এখন, পরে দেখা যাবে।

বনহুর ঝাঁম সর্দারের আড্ডার বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলো, মস্তবড় রথের মত একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

মালা সখীদেরসহ বনহুরকে নিয়ে রথের মধ্যে উঠে বসলো।

হাসলো বনহুর!

মালা বনহুরকে নিজের পাশে বসিয়ে সারথীকে বললো—রথ ছাড়।

বনহুরকে নিয়ে ঝাঁম রাজকুমারী চললো ভ্রমণে।

সখীগণ নানারকম আলাপ-ঠাট্টা, হাসি-তামাসা করতে লাগলো।

মালার মুখে উজ্জ্বল দীপ্ত, বার বার তাকাচ্ছে সে তার পাশের জনের দিকে। পাশে বসে অন্য কেউ নয়—বনহুর।

বন-জঙ্গল অতিক্রম করে চলেছে রাজকুমারী মালা তার প্রিয়জনকে নিয়ে। মালার বিশ্বাস, দেবরাজ কিউকিলাকে হত্যা করবেই—তারপর বিয়ে হবে দেবরাজের সঙ্গে তার।

ঝাঁম কুমারীর আবেষ্টনীতে বনহুর যেন জড়িয়ে পড়ছে। নিশ্চুপ বসে আছে সে, দেখছে কি করতে চায় এরা।

সমস্ত দিন বন-বাদাড়ে ঘুরেফিরে বেড়ালো বনহুর ঝাঁম রাজকুমারীর সঙ্গে। তারপর একসময় ফিরে এলো ঘাটিতে। অবসর সময়ে ওয়্যারলেস খুলে বসলো বনহুর—নূরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, নইলে নূরী অভিমান করে বসে থাকবে—আর কথাই বলবে না।

❑

বনহুরকে পেয়ে মালা আনন্দে আত্মহারা হলো। সখীদের সঙ্গ ত্যাগ করে বনহুরকে নিলো সে সঙ্গী করে। ঝাঁমরাজ কন্যার সখে বাধা দিতে পারলেন না, তিনি আরও ভালভাবে মিশবার সুযোগ-সুবিধা করে দিলেন এ ব্যাপারে। রাজবাড়ি সংলগ্ন উদ্যানে মালা বনহুরের সঙ্গে ভ্রমণ করবে। উদ্যানের মধ্যে আছে মস্তবাড় দীঘি, মালার বজরা ভাসতো দীগির কালো জলে, মালা বনহুরকে নিয়ে বজরার দীঘির মধ্যে বিচরণ করবে।

কিন্তু বনহুরের এসবে মোটেই মত নেই। সে যদিও মালার সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে লাগলো তবুও সবসময় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো মনে মনে। কিউকিলা হত্যা করতে এসে এ আবার কি ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লো। রহমানকে ব্যাপারটা সব খুলে বললো বনহুর—রহমান, বলো এখন কি করি? সব তো তুমি শুনলে?

রহমান জানে, তার সর্দার যতই উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চল দুষ্ট হোক, কিন্তু সে নিজের বেলায় অত্যন্ত সংযত। কত নারী বনহুরকে স্বামীরূপে পাবার জন্য জীবননাশ করেছে, তবুও তাকে পায়নি। নূরীর জীবনটাই একদিন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যেতো যদি না সে জোর করে নূরীকে সমর্পণ করতো তার হাতে। রহমান সর্দারকে চরমভাবে জানে—জানে সে, যত সুন্দরী অপ্সরী নারীই হোক না, কিছুতেই সর্দারের মন টলাতে পারবে না। কিন্তু সবেরই তো সীমা আছে—হাজার হলেও সর্দার মানুষ, ভুল করে বসাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। রহমানের মনে একটা দুশ্চিন্তার ছায়াপাত হয়। সর্দারের কথাবার্তায় সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, মালার আচরণ তাকে অত্যন্ত বিব্রত করে তুলেছে। নিজকে সংযত রাখাও হয়তো কঠিন হয়ে পড়বে শেষ মুহূর্তে, রহমান মাথা চুলকে বলে—সর্দার, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।

বলো?

সর্দার, মহারাজ মোহন্ত সিন্ধুর সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দিন জলদানব কিউকিলা হত্যা না করা পর্যন্ত আপনি রাজপ্রাসাদে আসতে পারবেন না বা তাঁর কন্যা মালার সঙ্গে মিশতে পারবেন না। এমন কি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঠিক বলছো রহমান। কিন্তু কিউকিলা হত্যার পর কিভাবে মালার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো?

সর্দার, তখন যা হয় করা যাবে। সম্মুখে যে বিপদ সেটা থেকে আমরা উদ্ধার পেলে তখন এতো দুশ্চিন্তা থাকবে না।

সত্যি রহমান, আমি যেন কেমন বুদ্ধিহারা হয়ে পড়ছিলাম। সামান্য কথাটা আমি ভাবিনি।

সর্দার, আমার বেয়াদবি মাফ করবেন, আপনাকে আমি বুদ্ধি বাতলে দি, এমন সাহস আমার ছিলো না।

হাসলো বনহুর এবার, বললো—তোমাকে তো একদিন বলেছি রহমান, তুমি আমার সহচর শুধু নও—আমার বন্ধু।

সর্দার! রহমান আবেগভরা কণ্ঠে বললো।

বনহুর শয্যা গ্রহণ করলো।

রহমান তার নিজের শয্যার দিকে এগিয়ে গেলো। রাত তখন অনেক হয়েছে।

একসময় ঘুমিয়ে পড়লো রহমান।

বনহুরের চোখে ঘুম নেই, যেমন করে হোক কিউকিলাকে হত্যা করতেই হবে, ঝাঁম অধিবাসিগণকে এই নৃশংস হত্যা থেকে উদ্ধার করতে হবে, বাঁচাতে হবে সবাইকে। তারপর সাগরতলের রাজপ্রাসাদ তার চাই। কিন্তু মালা—মালাকে নিয়েই তার বেশি চিন্তা......

বনহুর যখন ঘাটিতে শয্যায় শয়ন করে এসব নিয়ে ভাবছে, ঠিক তখন সিন্ধি সমুদ্রের মধ্যে বিরাট একটা দেহ মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালো। যমকালো পাথরের মূর্তির মত গোলাকার মাথায় ফুটবলের মত একটা চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

পরবর্তী বই

কিউকিলা ও দস্যু বনহুর

কিউকিলা ও দস্যু বনহুর-৩৮

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

দৈত্যরাজ কিউকিলা তার বিরাট দেহ নিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে শহরের দিকে। তেলের পিঁপের মত মাথাটির উপর ষ্টীমারের সার্চলাইটের মত চোখটা যেন আগুন ছড়াচ্ছে। যে পথ দিয়ে কিউকিলা অগ্রসর হচ্ছিলো সেই পথের দু'পাশের বড় বড় দালান-কোঠাগুলো খেল্না ঘরবাড়ির মত কিউকিলার পায়ের তলায় থেতলে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিলো। নিদ্রায় অচেতন নগরবাসিগণ কিউকিলার পায়ের চাপে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ছিলো। কেউ কেউ বা অর্ধমৃত অবস্থায় আর্তনাদ করে ছুটে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছিলো কিন্তু পালাতে সক্ষম হচ্ছিলো না তারা। কিউকিলা তাদের ধরে ফেলছিলো এবং রক্তপায়ী বাদুড়ের মত তাদের বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছিলো।

ভয়ঙ্কর কিউকিলার কবল থেকে কারো রক্ষা নেই।

গভীর রাতের নিস্তব্ধতার বুকে জেগে উঠছিলো এক মর্মভেদী আর্তচিৎকার।

ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের, সে দ্রুত শয্যায় উঠে বসে।

এমন সময় রহমান শশব্যস্তে ছুটে আসে বনহুরের শয্যার পাশে—সর্দার, সর্দার, কিউকিলা শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছে.....কিউকিলা শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছে.....

বনহুর বলে উঠলো—আমিও ঐ রকম অনুমান করছি রহমান।

সর্দার, ঐ শুনুন জনগণের করুণ আর্তচিৎকার!

বনহুর ততক্ষণে শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁম-সর্দার দলবল নিয়ে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর রহমানের পাশে। সকলেরই চোখেমুখে এক ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্নতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ব্যস্তকণ্ঠে বললো ঝাঁম-সর্দার—হুজুর, হুজুর......কিউকিলা, কিউকিলা....আর বিলম্ব নেই....এসে পড়েছে, কিউকিলা এসে পড়েছে.....হুজুর, এখন উপায় কি?

বনহুর গম্ভীর হয়ে একটু চিন্তা করলো, পরক্ষণেই ঝাঁম-সর্দারকে উদ্দেশ্য করে বললো—সর্দার, তুমি তোমার দলবল নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যাও। বিষমাখা তীর নিয়ে সবাই প্রস্তুত হয়ে থেকো, কিউকিলাকে দেখামাত্র দূর থেকে অবিরত তীর নিক্ষেপ করবে ঠিক তার কপালে চক্ষুটা লক্ষ্য করে। যাও, বিলম্ব করো না।

রহমান বলে উঠলো—এইদিকেই কিউকিলা আসছে বলে মনে হচ্ছে। ঐ যে দালান-কোঠা ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে মানুষের আর্তচিৎকারও ভেসে আসছে।

বনহুর দ্রুতহস্তে ড্রেস পরে নিলো।

বাইনোকুলার আর রিভলভার নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো—রহমান, আমাকে অনুসরণ করো।

ততক্ষণে ঝাঁম-সর্দার দলবল নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেছে সেখান থেকে।

রহমান বনহুরের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

ঘাঁটির বাইরে আসতেই নজরে পড়লো তাদের—দৈত্যরাজের মত জমকালো একটা বিরাট দেহ সম্মুখে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তে বুঝে নিলো, কিউকিলা এবার একেবারে নিকটে এসে পড়েছে।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—শীগগির মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো রহমান......নিজেও সে দ্রুত উবু হয়ে শুয়ে পড়লো মাটির মধ্যে।

রহমানও মুহূর্ত বিলম্ব না করে ভূতলে শুয়ে পড়লো।

অল্পক্ষণে দু'খানা পা এগিয়ে এলো তাদের দিকে। পা নয় যেন তালগাছের দুটো গুঁড়ি।

পাশেই কতকগুলো গাছপালা ভেংগে পড়ার মড় মড় শব্দ হলো, বনহুর তাকিয়ে দেখলো, একটি তালগাছের গুঁড়ি তার দক্ষিণ বাহুর পাশে এসে পড়েছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে মাটি চেপে পড়ে রইলো বনহুর আর রহমান। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে, রহমানের দিকে তাকিয়ে একবার দেখলো বনহুর, বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল।

বনহুর আর রহমান মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো, তাদের কানে ভেসে আসছে নর-নারীর করুণ আর্তনাদ—বাঁচাও....বাঁচাও....বাঁচাও.....

বনহুর আর রহমান যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে তখন কিউকিলার তালগাছের গুঁড়ির মত পা খানা সরে গেলো ঝড়ের বেগে।

নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো রহমান।

বনহুর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো—রহমান, শীগগির পিছন দিকে কোনো আড়ালে লুকিয়ে পড়ো। কিউকিলা সম্মুখে কোনো লোককে ধরার জন্য উন্মাদ হয়ে ছুটে যাচ্ছে।

বনহুর আর রহমান দু'জনা একসঙ্গেই একটা ভাঙা কক্ষের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। বনহুর বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখলো, অদূরে একটা লোককে দক্ষিণ হাতের মুঠায় চেপে ধরে বুকের কাছে দাঁত বসিয়ে দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে কিউকিলা।

কিউকিলার ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত।

রহমান শিউরে উঠে বললো—সরদার, কি ভয়ানক নৃশংস দৃশ্য!

ঠোঁটের উপর আংগুল চাপ দিলো বনহুর।

কিউকিলা মৃতদেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের মত।

ঠিক বনহুর আর রহমান যে স্থানে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই স্থানে এসে পড়লো লোকটার মৃতদেহটা। যদিও ঝাপসা অন্ধকারে লোকটির দেহ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না তবু বুঝা গেলো—দেহটা অসাড়—প্রাণহীন।

এবার দৈত্যরাজ দীর্ঘ পদক্ষেপে পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

নিশ্বাস নিলো রহমান।

বনহুর তখন দক্ষিণ হস্তে রিভলভার চেপে ধরে কিউকিলাটিকে অনুসরণ করলো।

কিউকিলা অভিমুখে পা বাড়াতেই রহমান বনহুরকে চেপে ধরলো—সর্দার যাবেন না, যাবেন না সর্দার......

রহমান, এখন চুপ থাকার সময় নয়, যেমন করে হোক দৈত্যরাজ কিউকিলাকে শেষ করতে হবে।

সর্দার, যে জীবের দেহে কামানের গোলা বিদ্ধ হয়নি, কি করে আপনি সেই জীবকে হত্যা করবেন? সর্দার, আপনি ক্ষান্ত হন......

রহমান, আমার সঙ্গে এসো, আমি ঐ নরহত্যাকারী জীবটাকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হবো না।

সর্দার!

বনহুর পুনরায় বললো—আমি বুঝতে পেরেছি, কিউকিলাকে কাবু করার একটিমাত্র উপায় আছে—সে হলো কিউকিলার ঐ চোখটা। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছো, তার দেহে কামান বা রাইফেল-বন্দুকের গুলী বিদ্ধ না হলেও তার চোখে সে কোনোরকম আলো সহ্য করতে পারে না। যখনই আলো পড়বে তখনই সে চোখটাকে পিছন দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এমন কি আলোকরশ্মি স্তম্ভের আলো সে সহ্য করতে গিয়ে মাথা বিপরীত দিকে করে রেখেছে। ভুলক্রমেও সে তাকায়নি আমাদের দিকে।

হাঁ সর্দার, কিউকিলা আলো সহ্য করতে পারে না, এটা আমরা বুঝতে পেরেছি।

সেই কারণেই এই ভয়ঙ্কর জীবটা শুধু রাতের অন্ধকারেই শহরের বুকে হানা দিয়ে থাকে এবং দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকে সাগরতলায়। রহমান, কোনোক্রমে ঐ জীবটার চোখে গুলী বিদ্ধ করতে পারলেই আমরা জয়ী হবো।

সর্দার, সত্যি বলছেন?

হাঁ, রহমান, সত্যি এবং আমি সেই কারণেই কিউকিলাকে অনুসরণ করছি।

কিন্তু কিউকিলার চোখে গুলী বিদ্ধ করা....থেমে পড়লো রহমান—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো; কারণ সে জানে—কিউকিলার চোখে গুলী বিদ্ধ করা সাংঘাতিক ব্যাপার।

বনহুর বললো—রহমান, তুমি কখনো ঘাবড়াবে না। বনহুর কথাটা বলে দ্রুত অগ্রসর হলো। যে দিকে কিউকিলা চলে গেছে সেই পথে এগুতে লাগলো তারা। অন্ধকারে যদিও নানারকম অসুবিধা হচ্ছিলো তবু বনহুর ও রহমান জীবটাকে অনুসরণ করলো।

সম্মুখে যমদূতের মত কিউকিলা এগিয়ে চলেছে—চারদিক থেকে ভেসে আসছে অগণিত জনগণের করুণ ভয়ার্ত চিৎকার। যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

একটা ভাঙ্গা দালানের আড়ালে আত্মগোপন করে বনহুর গুলী চালালো, কিন্তু এতো দূরে তখন সরে পড়েছে কিউকিলা যার জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। একবার নয়, বার বার গুলী করেও সে কৃতকার্য হলো না।

কিউকিলা তখন বিরাট লম্বা লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। হত্যার নেশা হয় তো তখনকার মত মিটে গেছে তার, ফিরে চলেছে নিজের আবাসে।

বনহুরের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো, জলদানব কিউকিলা অগণিত শহরবাসীকে নিহত এবং আহত করে ফিরে গেলো সমুদ্রের বক্ষে। বনহুর রহমানসহ চেষ্টা নিয়েছিলো কিউকিলার চোখে কোনোরকমে গুলী বিদ্ধ করা যায় কি না—কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, কিউকিলার মাথাটা ছিল অনেক উর্ধ্বে, কাজেই রাইফেল বা রিভলভারের গুলী সঠিকভাবে তার চোখে বিদ্ধ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছিলো।

কিউকিলা যখন সমুদ্রবক্ষে নামতে শুরু করলো তখন বনহুর তার 'শাহীর' ক্যাপ্টেন বোরহানের নিকটে ওয়্যারলেসে সংবাদ পাঠিয়ে দিলো, কিউকিলা গত রাতে যে স্থানে তলিয়ে গিয়েছিলো আজও সেই স্থানে তলিয়ে যায় কিনা লক্ষ্য রাখতে।

'শাহী' জাহাজ তখন ঝাঁম-সমুদ্রের তীর ছেড়ে প্রায় পাঁচ হাজার গজ দূরে অবস্থান করছিলো। 'শাহীর' মধ্যে ছিলো ক্যাপ্টেন বোরহান এবং বনহুরের বেশ কিছুসংখ্যক বিশ্বস্ত অনুচর। এরা সবসময় সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছে। দিনে এরা ঘুমাতো আর রাতে এরা জেগে থাকতো।

সর্বক্ষণ তাদের মনে নানারকম আশঙ্কা উঁকি দিতো, না জানি কখন কোন্ মুহূর্তে কিউকিলা তাদের জাহাজে হানা দিয়ে বসে! সেই কারণেই বনহুরের আদেশে 'শাহী'কে মাঝসমুদ্রে রাখা হয়েছিলো।

ওয়্যারলেসে সংবাদ পেয়ে বোরহান বাইনোকুলার যন্ত্র চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলো। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো বোরহান এবং তার সহকারিগণ। তারা দেখলো—তাদের জাহাজ ছেড়ে বহু দূরে বিরাট পর্বতের মত একটা দেহ এগিয়ে আসছে সমুদ্রের দিকে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও ঝাপসা কালোমত নজরে পড়তে লাগলো। আরও দেখতে পেলো, পর্বত আকার দেহটার কপালে আগুনের গোলার মত একটা চোখ টর্চলাইটের মত জ্বলছে।

বোরহান ওয়্যারলেসে বনহুরকে জানিয়ে দিতে লাগলো—সর্দার, আমাদের জাহাজ 'শাহী' এখন সমুদ্র তীর থেকে প্রায় পাঁচ হাজার গজ দূরে রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখন জমকালো পর্বতের মত একটা বিরাট দেহ মন্থর গতিতে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসছে......

বোরহান শুনতে পায় তাদের সর্দার দস্যু বনহুরের কণ্ঠস্বর—সাবধানে লক্ষ্য করো, জীবটা পূর্বদিন যে স্থানে তলিয়ে গিয়েছিলো সেই স্থানে তলিয়ে যায় কিনা। জায়গাটা তোমাদের সঠিক স্মরণ না থাকলে আজ ভালভাবে স্মরণ রেখো।

সর্দার, পূর্বদিন যে স্থানে জীবটা তলিয়ে গিয়েছিলো আজও সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা সেদিন কিউকিলাকে যে স্থানে ভেসে উঠতে দেখেছিলাম এটা কি সেই স্থান?

হাঁ সর্দার, আশ্চর্য! কিউকিলাকে আমরা প্রথম দিন যে স্থানে ভেসে উঠতে দেখেছি এটা ঐ স্থান। আরও লক্ষ্য করেছি, কিউকিলা যতবারই ভেসে উঠেছে এবং তলিয়ে গেছে ঐ একই স্থানে।

ঘাঁটিতে ওয়্যারলেসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো বনহুর, বোরহানের কথায় তার চোখ দুটো যেন বিস্ময়ে জ্বলে উঠে।

রহমান লক্ষ্য করছিলো সর্দারের পাশে দাঁড়িয়ে। সে বুঝতে পারে, সর্দার বোরহানের কথায় কোনো ক্লু খুঁজে পেয়েছেন।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—কিউকিলার বাস সমুদ্রগর্ভে হলেও তার বাসস্থান এমন এক স্থানে যে স্থান তার অতি পরিচিত। রহমান, আমি কিউকিলার বাসস্থান আবিষ্কার করতে চাই।

সর্দার, আপনি এ কি কথা বলছেন?

যা বলছি তা আমি করতে চাই এবং করবো......

মনে মনে শিউরে উঠলো রহমান।

❑

বনহুর তার ঘাটি থেকে ফিরে এসেছে 'শাহী' জাহাজে। আলোকরশ্মি স্তম্ভ আবার বসানো হয়েছে জাহাজের ডেকের উপর। সমস্ত অনুচর এবং ঝাঁম সর্দার বনহুরকে তার দলবল নিয়ে 'শাহী' জাহাজে কিউকিলা হত্যার জন্য বনহুরকে নানারকম সাহায্য করে চলছে।

বনহুর বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছে—এবার কিউকিলার আবাসস্থল সে দেখবে—তারপর তাকে হত্যার ব্যবস্থা নেবে নতুনভাবে।

ঝাঁম শহরের সেরা কয়েকজন ডুবুরীকে বনহুর নিয়ে এসেছে কিন্তু বহু অর্থের বিনিময়েও তারা সমুদ্রগর্ভে নামতে রাজি হয়নি। মরতে তারা ভয় পায় না কিন্তু কিউকিলার হস্তে মরতে তারা রাজি নয়।

ডুবুরিগণ রাজি না হলেও বনহুর ক্ষান্ত হলো না। সে নিজে সমুদ্রগর্ভে নামবে বলে মন স্থির করে নিলো। সে দেখতে চায়, কিউকিলা কোথায় বাস করে এবং সমুদ্রগর্ভে কি করে সে।

বনহুরের মনোভাব প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরদের মধ্যে ভীষণ একটা দুশ্চিন্তার ছায়াপাত হলো, বিশেষ করে সর্দারকে হারাতে তারা চায় না। রহমান নিজে ডুবুরীর পোশাক পরে সমুদ্রগর্ভে নামবে বলে সর্দারকে জানালো। বনহুরের আরও কয়েকজন অনুচরও এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখলো। তারা বললো—সর্দার, হুকুম করুন, আমরা জীবন দিয়েও কিউকিলা হত্যার জন্য চেষ্টা করবো।

বনহুর কারো কথায় কান দিলো না, সে ডুবুরীর বেশে সজ্জিত হয়ে নিলো।

অবশ্য তার সঙ্গে দু'জন ডুবুরীও থাকবে।

বনহুর যখন ডুবুরীর ড্রেসে সজ্জিত হচ্ছিলো তখন ঝাঁম-রাজকন্যা মালা এসে হাজির। সে লোকমুখে জানতে পেরেছে, বনহুর সমুদ্রবক্ষে গভীর জলমধ্যে অবতরণ করবে। কথাটা শুনে শিউরে উঠেছিলো মালা—সর্বনাশ, ওকে তাহলে চিরদিনের জন্য হারাতে হবে। মালা পিতার কাছে অনুরোধ করেছিলো—বাবা, ওকে তুমি ক্ষান্ত করো। কিউকিলা হত্যা করতে গিয়ে এমন সুন্দর একটা জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি দেবরাজকে ফিরিয়ে আনো। চোখে রুমাল চাপা দিয়ে কেঁদেছিলো মালা তবু ঝাঁমরাজ কন্যাকে আশ্বাস দিতে পারেননি কারণ কিউকিলাকে হত্যা না করলেই নয়। কিউকিলার অত্যাচারে সমস্ত ঝাঁম শহর একেবারে নিঃশেষ হতে চলেছে।

মালা অগত্যা নিজেই তার ঘোড়াগাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে সমুদ্রের ধারে। তারপর মোটরবোট যোগে পৌঁছে গেছে সে একেবারে 'শাহী' জাহাজে।

মালাকে দেখে বনহুর বিস্মিত হলো, অবাক কণ্ঠে বললো—মালা তুমি!

মালা বনহুরের জামাটা এঁটে ধরলো—তুমি নাকি সমুদ্রে অবতরণ করছো?

হাঁ মালা।

না, আমি তোমাকে সমুদ্রে অবতরণ করতে দেবো না দেবরাজ। মালা বনহুরকে 'দেবরাজ' বলে ডাকতো।

অবশ্য বনহুরের এ নামটা দিয়েছিলেন মহারাজ মোহন্ত সিন্ধু। বনহুরের সৌন্দর্যে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই কারণে 'দেবরাজ' বলে ডাকতেন। ঝাঁম শহরের লোকজন সবাই বনহুরকে অত্যন্ত ভক্তি করতো—তারাও তাকে 'দেবরাজ' বলতো।

মালার কথায় বনহুর হাসলো, তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো পরপর দুটি মুখ—মনিরা আর নূরী। তারাও আজ পাশে থাকলে তাকে এমনি করেই বাধা দিতো। বললো বনহুর—মালা, কিউকিলাকে হত্যা না করলেই যে নয়। জানো তো, ঝাঁমবাসীর সম্মুখে আজ কি বিপদ?

জানি কিন্তু তোমাকে সমুদ্রগর্ভে নামতে দেবো না।

ভয় পেয়ো না মালা, আমি কিউকিলার বাসস্থান শুধু দেখে আসবো।

সর্বনাশ! কিউকিলা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।

মালা, এতো লোকের জীবনের বিনিময়ে গেলোই বা আমার একটি জীবন....

না না, আমি তোমাকে সমুদ্রে অবতরণ করতে দেবো না, খুলে ফেলো তুমি ডুবুরী ড্রেস।

বনহুর বিপদে পড়লো যেন, ঝাঁম ভাষায় সে নানাভাবে মালাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। মালা শুধু নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো। নিজের অজান্তে বনহুরকে সে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলো তাই সে কিছুতেই তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারলো না।

কিন্তু বনহুর অন্য ধরনের পুরুষ—তাকে কোনোদিন ভয়-ভীতি আতঙ্কগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়নি। আজ সে মালার কথায় বা তার চোখের পানিতে নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে না। সব বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে দস্যু বনহুর ডুবুরীর ড্রেসে সজ্জিত হয়ে ডেকে এসে দাঁড়ালো।

বনহুরের অনুচরগণের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ঝাঁম-সর্দার দলবল নিয়ে থ' মেরে দাঁড়িয়ে

আছে। এমন কি মহারাজ মোহন্ত সিন্ধুও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বাধা দিতেও পারছেন না। বনহুরের উপর তাঁর বিশ্বাস—কিউকিলার বাসস্থানের সন্ধান সে আনতে পারবে; কিন্তু ভয়ও হচ্ছে—যদি আর ফিরে না আসে!

বনহুরের সঙ্গে দু'জন ডুবুরী নামতে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু তারা জাহাজ ছেড়ে দু'শত গজের মধ্যে থাকবে, তার বেশি তারা যাবে না।

বনহুর প্রথম জাহাজ থেকে বোটে অবতরণ করলো। শুধু মুখটা খোলা রয়েছে আর সারা দেহে তার ডুবুরীর ড্রেস। সঙ্গী ডুবুরীদ্বয়ও বনহুরের সঙ্গে জাহাজ থেকে বোটে নেমে এলো।

রহমান তার কয়েকজন অনুচর ও কয়েকজন ডুবুরীসহ বোটে নামলো কারণ অক্সিজেনের পাইপ এবং যন্ত্রপাতি বোটেই থাকবে।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে মোহন্ত সিন্ধু এবং মালা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে লাগলো।

বনহুর বিলম্ব না করে সমুদ্রবক্ষে নেমে পড়লো। বনহুরের সঙ্গে দু'জন ডুবুরী তাকে অনুসরণ করলো। তিনজন মিলে ক্রমান্বয়ে নেমে চললো সমুদ্রগর্ভে!

বোটের উপরে আতঙ্কিত হৃদয় নিয়ে রহমান ও দলবল অপেক্ষা করতে লাগলো।

দু'জন ডুবুরী ও দস্যু বনহুর গভীর জলের তলায় সাঁতার কেটে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের পাশ কেটে চলে যাচ্ছে কত নাম না জানা মাছ এবং জল-জীব। বনহুরের দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা আর বাম হস্তে তীব্র আলোক-বিচ্ছুরিত টর্চ।

বনহুরের সঙ্গীদ্বয়ের হস্তেও ছোরা আর ঐ ধরনের টর্চ রয়েছে।

প্রায় বিশগজ নিচে অবতরণ করার পর হঠাৎ একটা বিকটা শব্দ তাদের কানে এলো; চমকে উঠলো ডুবুরীদ্বয়। বনহুরও বিস্মিত হলো—কিসের এ শব্দ! ভীষণ কানফাটা আওয়াজ। কিন্তু পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। বনহুর আর ডুবুরীদ্বয় সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো, একটা হাঙ্গর আর অক্টোপাশে লড়াই চলেছে। বনহুর বুঝতে পারলো, অক্টোপাশের কবলে পড়ে হাঙ্গরটা মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং সে-ই ঐ রকম বিকটা শব্দ করছিলো।

ডুবুরীদ্বয় ও বনহুর দূর থেকে এই দৃশ্য দেখতে লাগলো কিন্তু বেশিক্ষণ সেইস্থানে বিলম্ব করতে সাহসী হলো না তারা। হাঙ্গর আর অক্টোপাশে তুমুল ধস্তাধস্তি ধাক্কায় সেখানের জলরাশি যেন তোলপাড় হচ্ছিলো। তাড়াতাড়ি সরে পড়লো বনহুর আর তার সঙ্গীদ্বয়।

গভীর তলদেশে আরও নেমে চলেছে বনহুর ও ডুবুরীদ্বয়। কিছুটা অগ্রসর হতেই অদূরে পাথরখন্ডের উপরে বিরাট বিরাট দেহ-পা ওয়ালা কতগুলো জীব হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বনহুর বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো, জীবগুলো অন্য কিছু নয়—সামুদ্রিক কাঁকড়া। কি ভয়ঙ্কর আর বিকট চেহারা কাঁকড়াগুলোর। সম্মুখের পা উঠিয়ে মাঝে মাঝে বড় বড় মাছ ধরে মুখের কাছে টেনে নিচ্ছে। সম্মুখের পাগুলো যেন এক-একটা করাতের মত ধারালো আর সাঁড়াশির মত দেখতে। বিরাটদেহী কাঁকড়াগুলোর চোখ যেন ইলেকট্রিক বলের মত জ্বলছে।

মানুষের আভাস পেয়েছে হয়তো, কাঁকড়াগুলো হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো; দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো এদিকে।

বনহুর সঙ্গীদ্বয়সহ সেখান থেকে সরে পড়লো ক্ষিপ্রগতিতে। একসঙ্গে প্রায় সাঁতার কেটে চলেছে ওরা।

বনহুর সর্বপ্রথমে—পিছনে চলেছে ডুবুরীদ্বয়।

বনহুরের চোখে বাইনোকুলার লাগানো রয়েছে, সে চারদিকে সর্তক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অগ্রসর হচ্ছে। বনহুরের ইচ্ছা—আরও দূরে গভীর সমুদ্রতলে নেমে যায় কিন্তু ডুবুরীদ্বয় আর দূরে যেতে রাজি নয়।

ফেরার জন্য অগ্রসর হতেই একটা বিরাট জল-জন্তু আকারে ঠিক কচ্ছপের মত তাড়া করে এলো ভীষণভাবে।

বনহুর ডুবুরীদ্বয়কে দ্রুত একপাশে সরে যাবার জন্য ইংগিত করলো।

ডুবুরীদ্বয় কিছুটা সরে যেতে না যেতেই কচ্ছপরাজ এসে আক্রমণ করলো বনহুরকে। বনহুরের দক্ষিণ হস্তে ছিলো সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা—কচ্ছপরাজ তাকে আক্রমণ করতেই বনহুর ছোরাখানা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলো। শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

ডুবুরীদ্বয়ের হস্তেও ছোরা ছিলো কিন্তু তারা এগুতে সাহসী হলো না। বনহুর একাই লড়াই করে চললো। বনহুরের দেহে ডুবুরীর মজবুত ড্রেস থাকায় কচ্ছপরাজ সহজে তার দেহে আঁচড় কাটতে বা দাঁত বসাতে পারলো না।

বনহুর কৌশলে কচ্ছপটাকে কাবু করার চেষ্টা করতে লাগলো।

ডুবুরীদ্বয় বহুবার সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করেছে কিন্তু এমন বিপদে তারা পড়েনি কোনোদিন। তারা ভয়ানকভাবে ঘাবড়ে গেলো, বনহুরকে সহায়তা করার ইচ্ছা থাকলেও কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারছিলো না।

বেশ কিছুক্ষণ কচ্ছপটার সঙ্গে লড়াই চলার পর হঠাৎ বনহুর তার ছোরা দিয়ে কচ্ছপটার গলায় আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা কচ্ছপের গলার নালী ভেদ করে প্রবেশ করলো ভিতরে।

মুহূর্তে কচ্ছপটা কাৎ হয়ে উল্টে গেলো, পরক্ষণে পুনরায় সোজা হওয়ার জন্য চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো সমুদ্রের ঘোলাটে পানির কিছুটা অংশ।

কচ্ছপের কবল থেকে মুক্ত হলো বনহুর, হাঁপাচ্ছে সে। এবার বনহুর সঙ্গীদ্বয়সহ এগুতে লাগলো কিন্তু বেশিদূরে অগ্রসর হতে পারলো না, সমুদ্রতলে জলীয় উদ্ভিদের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো তাদের দেহ। জলীয় উদ্ভিদগুলো কতকটা লতা-গুল্মের মত অত্যন্ত শক্ত এবং শিকড় জাতীয়।

আবার ভীষণ এক বিপদের সম্মুখীন হলো তারা। সমস্ত শরীরে শিকড়ের মত জলীয় উদ্ভিদগুলো এঁটে বসে যাচ্ছে যেন। বনহুর সঙ্গীদ্বয়কে সুতীক্ষ্ণ ছোরা দ্বারা শিকড় জাতীয় উদ্ভিগুলো কেটে ফেলবার জন্য বললো।

কিন্তু আশ্চর্য! যতই লতা-গুল্মগুলোকে তারা দেহ থেকে ছিন্ন করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো ততই যেন আরও জড়িয়ে পড়ছে তাদের দেহের সঙ্গে আঠালো বস্তুর মত।

ডুবুরীদ্বয় প্রায় মরিয়া হয়ে উঠলো।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মুক্ত হয়ে পড়লো। এবার সে তার সঙ্গীদ্বয়কে মুক্ত করে নেবার জন্য সংগ্রাম করে চললো। সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা দ্বারা ডুবুরীদ্বয়ের দেহের আবেষ্টন কেটে ছাড়িয়ে নিচ্ছে সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে।

বহুক্ষণ সময় লেগে গেলো, বহুকষ্টে ডুবুরীদ্বয়কে উদ্ধার করে নিয়ে ফিরে চললো তাদের জাহাজ অভিমুখে। আজ কিউকিলার কোনো সন্ধানই তারা পেলো না।

এদিকে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অস্থির চিত্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করছে সিন্ধু মহারাজ মোহন্ত আর তার কন্যা মালা।

রহমান এবং বনহুরের অনুচরগণও অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বিপুল আগ্রহ নিয়ে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলো। সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া—না জানি কেমন আছে তারা! না জানি কখন কি বিপদ ঘনিয়ে আসে তাদের সর্দারের ভাগ্যে!

সবাই যখন চিন্তামগ্ন তখন বনহুর ডুবুরীদ্বয়সহ ফিরে এলো জাহাজে ওরা ফিরে আসতেই আনন্দধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো 'শাহী' জাহাজখানা! কিউকিলার আবাসস্থল হতে তারা জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে—এটাই হলো তাদের খুশির কারণ।

মালা তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে, সিন্ধু ভাষায় জানাতে লাগলো তাকে অভিনন্দন। কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনলো

মালা, বনহুর কিউকিলার বাসস্থানের সন্ধান পায়নি এবং সে পুনরায় যাবে তখন তার মুখখানা শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেলো।

মালা সচ্ছভাবে বনহুরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করেছিলো। এটা তাদের দেশের নিয়ম, কাজেই লজ্জা বোধ করেনি সে।

বনহুর কিন্তু তার অনুচরদের সম্মুখে এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলো।

বনহুর ড্রেস পরিবর্তন করে যখন নিজের ক্যাবিনে এসে বসলো তখন সে আরও অবাক হলো। দেখলো মালা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

বনহুর তার শয্যায় বসে তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছে শুকনো করছিলো। মালা এগিয়ে এলো—তোয়ালে আমাকে দাও, আমি তোমার মাথার জল শুকিয়ে দিচ্ছি।

বাধা দিয়ে বললো বনহুর—তুমি রাজকুমারী, কেন আমার জন্য এতো করতে যাবে মালা?

বনহুরের কণ্ঠ তার কোমল হাত দু'খানা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো মালা—ক'দিন পর তুমি আমার স্বামী হবে আর আমি তোমার জন্য এটুকু কষ্ট করতে পারবো না'?

বনহুরের ভ্রু কুঁচকে উঠলো মুহূর্তের জন্য। কোনো উত্তর সহসা দিতে পারলো না সে।

মালার ওষ্ঠদ্বয় বনহুরের চিবুক স্পর্শ করলো, বললো সে—কোনো উত্তর দিচ্ছো না কেন দেবরাজ?

বনহুর মালার নিকট হতে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য টেবিল থেকে বাইনোকুলারটা হাতে তুলে নিয়ে মালার চোখে ধরলো—মালা, এটা দিয়ে তাকিয়ে দেখো, ঐ যে প্রচন্ড ঢেউ-এর উচ্ছ্বাস দেখছো ওখানে আবার আমাকে যেতে হবে।

শিউরে উঠলো মালা!

প্রচন্ড ঢেউগুলো গর্জন করে ছুটে চলেছে, যেন বিরাট বিরাট এক একটি ভয়াল পর্বতমালা। সেকি ভয়ঙ্কর সমুদ্রবক্ষ! মালা বাইনোকুলারসহ বনহুরের হাতখানা চেপে ধরলো।

বনহুর বললো—ওখান থেকে যদি ফিরে না আসি?

না না....মালা বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না দেবরাজ?

এমন সময় বাইরে রাজা মোহন্ত সিন্ধু আর বোরহানের কণ্ঠ শুনতে পায়। মালাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে দরজার দিকে।

মোহন্ত সিন্ধু বৈজ্ঞানিক ফিরার্ড ও বোরহান ক্যাবিনে প্রবেশ করেন।

বৈজ্ঞানিক ফিরার্ড ঝাঁম-রাজ্যেরই একজন অধিবাসী। তিনিও কিউকিলা হত্যার জন্য নানারকমে চেষ্টা করে চলেছেন।

বনহুর তাদের বসবার জন্য অনুরোধ জানালো।

আসন গ্রহণ করলেন তারা।

মালা পিতার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

বনহুর নিজেও একটা আসন গ্রহণ করে সিগারেট-কেসটা বাড়িয়ে ধরলো মোহন্ত সিন্ধু ও ক্যাপ্টেন বোরহানের দিকে।

সিগারেট পান করতে করতে আলাপ চললো।

মোহন্ত সিন্ধু বনহুরকে লক্ষ্য করে বললেন—আচ্ছা দেবরাজ, আপনি কিউকিলা হত্যা ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং চিন্তিত রয়েছেন। আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন এই জলদানবকে হত্যা করে ঝাঁম বাসিগণকে উদ্ধার করেন, তাই না?

হাঁ, মহারাজ, আমার এটাই ইচ্ছা। বললো বনহুর।

পুনরায় বললেন মোহন্ত সিন্ধু—কিন্তু আপনার অদ্ভুত মেশিন আলোকরশ্মি স্তম্ভ কিউকিলার কিছু করতে পারলো না তো?

এবার বলে উঠে ক্যাপ্টেন বোরহান—আশ্চর্য এখানেই। আলোকরশ্মি স্তম্ভের বৈদ্যুতিক রশ্মিতে যে কোনো কঠিন বস্তু গলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় অথচ কিউকিলার রক্ত-মাংসের দেহ বিনষ্ট হলো না।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আশ্চর্য কিছু নয়। আলোকরশ্মি স্তম্ভের মারাত্মক বৈদ্যুতিক রশ্মি কিউকিলাকে ভস্মীভূত করতে সক্ষম হয়নি সত্য, কিন্তু এর কারণও আছে। কিউকিলার দেহের চামড়া এতো শক্ত এবং কঠিন যা শত শত গন্ডারের চামড়ার চেয়েও মজবুত। তা ছাড়াও আর একটি কারণ রয়েছে আমরা কিউকিলাকে কোনো সময় স্থিররূপে পাইনি। আলোকস্তম্ভের রশ্মি বিচ্ছুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সরে পড়েছে বা সমুদ্রবক্ষে ডুব মেরেছে। কাজেই হাজার হাজার গুণ ভোল্টের আলোকরশ্মিও তাকে নিহত করতে পারেনি। তবে আমার বিশ্বাস, আলোকরশ্মি স্তম্ভের রশ্মি তার দেহকে বিদগ্ধ করেছে নিশ্চয়ই।

থামলো বনহুর।

মোহন্ত সিন্ধু বললেন—সত্যি দেবরাজ, আপনার এই অদ্ভুত আলোকরশ্মি স্তম্ভের কার্যবলী লক্ষ্য করে আমি শুধু বিস্ময়াহতই হইনি বরং আমি অত্যন্ত বিমুগ্ধ হয়েছি, যদিও কিউকিলা হত্যার জন্য এই রশ্মি দ্বারা আমার রাজ্যের প্রচুর বৃক্ষলতা এবং শস্যাদি বিনষ্ট হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ফিরার্ড বললেন—দেবরাজ, আমি একটি কথা জানতে চাই—এমন একটি মারাত্মক রশ্মি আপনার হাতে থাকা সত্ত্বেও আপনি

সাগরতলে কিউকিলার আবাসস্থল কেন অন্বেষণ করে চলেছেন? আপনার আলোকরশ্মি স্তম্ভের আলো কি সমুদ্রগর্ভে প্রবেশে সক্ষম নয়?

একটু হেসে বললো বনহুর—কিউকিলার আবাসস্থল নিশ্চয়ই গভীর জলের তলদেশে.......

বললেন বৈজ্ঞানিক—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোহন্ত সিন্ধুও বললেন—আমারও সেরকমই মনে হয়।

বনহুর বললো—সন্দেহ নয় মহারাজ—সত্য; কিউকিলা শুধু গভীর জলমধ্যেই থাকে না, সে এমন কোনো স্থানে বাস করে যেখানে পৃথিবীর কোনো রশ্মিই পৌঁছতে সক্ষম নয়। এমন কি মারাত্মক আলোকস্তম্ভের বৈদ্যুতিক রশ্মিও সেখানে প্রবেশে অক্ষম।

বনহুরের কথায় ক্যাবিনের প্রতিটি মানুষের মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

মালার চোখমুখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠেছে, মুখমন্ডল অত্যন্ত গম্ভীর। মালা নির্বাক স্তব্দ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে। বনহুরের কথাগুলো যেন তার কানে অদ্ভুত শোনাচ্ছিলো।

মোহন্ত সিন্ধু বললেন—এবার তাহলে কি কিউকিলাকে হত্যা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না?

বৈজ্ঞানিক ফিরার্ড বললেন—হতে পারে এবং তাকে ভস্মীভূত করতে হবে। আলোকরশ্মি স্তম্ভের যে তেজ আছে তার তেজশক্তি আরও বাড়িয়ে দিতে হবে।

বললো বনহুর—আমিও ঐ রকম চিন্তা করেছিলাম মিঃ ফিরার্ড, কিন্তু কিউকিলা আমাদের চেয়েও শতগুণ চালাক, তাকে আলোকরশ্মি স্তম্ভের সীমানার মধ্যেই পাওয়া যাবে না।

তাহলে কি আলোকরশ্মি দ্বারা তাকে হত্যা করা সম্ভব নয় আপনি মনে করেন?

হাঁ মহারাজ! মোহন্ত সিন্ধুর কথায় বললো বনহুর।

পুনরায় মহারাজ সিন্ধু প্রশ্ন করলেন—কিউকিলাকে হত্যা করা যদি সম্ভব নয় তবে কেন আপনি এতো কষ্ট করে সমুদ্রবক্ষে গভীর জলমধ্যে কিউকিলার বাসস্থানের সন্ধান করে চলেছেন?

বনহুরের মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেলো, শান্ত কণ্ঠে বললো বনহুর—কিউকিলাকে হত্যা করতেই হবে এবং যে কোনো উপায়ে। থামলো বনহুর, আংগুলের ফাঁকে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা ক্যাবিনের মেঝেতে নিক্ষেপ করে পা দিয়ে পিষে ফেললো, তারপর বললো—কিউকিলাকে হত্যা করতে হলে তার বাসস্থান খুঁজে বের করতে

হবে। নিশ্চয়ই ঐ জীবটা সাগরতলে কোনো ডুবন্ত পর্বতের গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং সময়মত বেরিয়ে আসে।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন বৈজ্ঞানিক ফিরার্ড—কিন্তু কি করে তাকে আপনি হত্যা করতে চান দেবরাজ?

ডিনামাইট ফিট করে তাকে হত্যা করতে হবে! বললো বনহুর।

ক্যাবিনের মধ্যে যে কয়েকজন লোক ছিলো সবাই একবার এ-ওর মুখে তাকিয়ে নিলো, মনের বিস্ময় ফুটে উঠেছে প্রত্যেকের চোখেমুখে!

অস্ফুট কণ্ঠে বললেন মহারাজ মোহন্ত সিন্ধু—ডিনামাইট!

হাঁ, একটি নয়—কয়েকটি ডিনামাইট প্রয়োজন আমাদের। প্রথমে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে কিউকিলা কোথায় বাস করে—তারপর সেই জায়গায় ডিনামাইট বসিয়ে দিতে হবে......

মালা এবার আর্তকণ্ঠে বলে—দেবরাজ, এতোবড় দুঃসাহস তোমার হলো কি করে? সমুদ্রতলে তুমি ডিনামাইট বসাতে যাবে?

হাঁ, তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিউকিলাকে নিহত করতে হলে তাকে ডিনামাইট দ্বারা ধ্বংস করতে হবে এবং আমি সেই কারণেই সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করে কিউকিলার আবাসস্থল অন্বেষণ করে চলেছি।

ক্যাবিনস্থ সকলের মুখেই আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠলো। সবাই বিস্মিত হতবাক হয়ে পড়লো। মোহন্ত সিন্ধু যদিও কিউকিলার অত্যাচারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তবু দেবরাজের কথায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেলো! গভীর সমুদ্রতলে কিউকিলার বাসস্থানে ডিনামাইট বসানো যে সামান্য ব্যাপার নয়, এ কথা তিনি জানেন।

রহমানের দুঃসাহসী মনেও ভয়ের সঞ্চয় হলো, সে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলো না।

ক্যাবিনের প্রতিটি মানুষের মুখ শুকিয়ে চুন হয়ে গেছে, এ যে অসাধ্য ব্যাপার যা তারা কল্পনাও করতে পারেনা। ভয়ঙ্কর সমুদ্রবক্ষে গভীর জলের তলায় ডিনামাইট ফিট করা কম কথা নয়, তাও কিউকিলার মত দৈত্যরাজের বাসস্থানে!

মালা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো!

রহমান বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে, সে সর্দারের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট নয়। জানে তার সর্দার অসাধ্য সাধনে কোনোদিন পিছু পা নয়, তবু কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো সে।

বনহুর বৈজ্ঞানিক ফিরার্ড ও মোহন্ত সিন্ধুর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলো।

❑

নিস্তব্ধ গভীর রাত।

সমস্ত জাহাজখানা নীরব। শুধু অন্ধকার ডেকে একটা ভারী বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আপন মনে পায়চারী করছে বনহুর, তারই বুটের শব্দ গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতাকে যেন খান খান করে ফেলছিলো। অন্ধকারে যদিও তার মুখমন্ডল দেখা যাচ্ছিলো না তবু বুঝা যাচ্ছিলো, সে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কিছু চিন্তা করছিলো। তার আংগুলের ফাঁকে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা থেকে একটা ক্ষীণ ধূম্রশিখা বেরিয়ে মিশে যাচ্ছিলো অন্ধকারের বুকে, মাঝে মাঝে বনহুর সিগারেটটা চেপে ধরছিলো দু' ঠোঁটের মধ্যে। কখনও বা রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলো সমুদ্রবক্ষের জমাট অন্ধকারের দিকে।

অদূরে অন্ধকারে ডেকের আড়ালে আর একটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায়, গম্ভীর কণ্ঠে বলে—কে?

এগিয়ে আসে ছায়ামূর্তি—সর্দার!

রহমান তুমি!

সর্দার, সমস্ত রাত আপনি জেগে কাটাবেন?

তুমিও তো দেখছি জেগে আছো?

সর্দার!

তোমার চোখেও ঘুম আসছে না, এইতো?

সর্দার, আপনি এ দুরভিসন্ধি ত্যাগ করুন। কিউকিলা হত্যার জন্য আপনার জীবন আমরা বিনষ্ট হতে দেবো না।

এগিয়ে আসে বনহুর রহমানের পাশে, যদিও রহমানের মুখ সে দেখতে পাচ্ছিলো না তবু তার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো রহমান তার জন্য অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। বনহুর জানে, তার অনুচরগণ তাকে কত ভালবাসে! সাগরবক্ষে অবতরণ ব্যাপার শুধু তাদের চিন্তিতই করে তোলেনি, তাদের মনে ভীষণ একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। রহমানের কাঁধে হাত রাখে বনহুর, সান্ত্বনার স্বরে বলে—আমার কাজে বাধা দিও না রহমান। আমি জানি, তোমরা আমাকে যেমন ভালবাসো, সমীহ করো, তেমনি করো বিশ্বাস—কাজেই আমার উপর তোমাদের যে আস্থা সে আস্থা তোমরা হারিও না।

সর্দার, হঠাৎ যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বসে তাহলে কান্দাই ফিরে কি জবাব দেবো বৌরাণী আর বোন নূরীর কাছে।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বনহুর।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রহমান, বনহুরের হাসির কারণ সে সহসা খুঁজে পায় না।

বনহুরের বলিষ্ঠ কণ্ঠের তীব্র হাস্যধ্বনিতে নিস্তব্দ রাত্রির জমাট অন্ধকার যেন থরথর করে কেঁপে উঠে। হাসি থামিয়ে বলে সে—রহমান, দস্যু বনহুরের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হবে বা হতে পারে, এটা আশ্চর্য কিছু নয় এবং এজন্য তোমাদের কারো কাছে জবাবদিহিও করতে হবে না।

সর্দার!

রহমান, তোমাদের সর্দারের মৃত্যুর জন্য কোনোদিন তোমরা ঘাবড়াবে না বা বিচলিত হবে না। আমি জানি, আমার অবর্তমানেও তোমরা আমারি মত আমার আস্তানা পরিচালনা করবে।

রহমান আজ নিজকে স্থির রাখতে পারলো না, হঠাৎ বনহুরের পায়ের কাছে বসে পড়লো, দু'হাতে চেপে ধরলো বনহুরের পা দু'খানা—সর্দার!

বনহুর তাড়াতাড়ি রহমানকে তুলে নিলো, বুকে জড়িয়ে ধরে বললো—

রহমান, তোমরাই আমার ভরসা, আমার বন্ধু। কিউকিলা হত্যায় তোমরা আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে, এই আমার কাম্য।

সর্দার!

রহমান, ঝাঁমবাসীদের সম্মুখে আজ যে বিপদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা অতি ভয়ঙ্কর। কিউকিলা এই শহরটাকে নিঃশেষ করে ফেলবে এবং ঝাঁম দেশের কোনো অস্তিত্বই রাখবে না। তাই যেমন করে হোক, ঝাঁম দেশকে আর ঝাঁমবাসীদের বাঁচাতে হবে।

সর্দার, যে জীবকে কোনো শক্তিই কাবু করতে সক্ষম হলো না এমন কি আলোকরশ্মি স্তম্ভের বৈদ্যুতিক রশ্মিও যার কোনো ক্ষতি করতে পারলো না, তাকে আপনি......

হাঁ, আমি জানি তাকে হত্যা করতে হলে একমাত্র ডিনামাইট দ্বারা ধ্বংস করতে হবে।

কিন্তু আপনি যেভাবে বলছেন তাকি সম্ভব হবে সর্দার?

অসম্ভব হলেও তাকে সম্ভব করে নিতে হবে।

সর্দার, কোনো ডুবুরীকে দিয়ে অর্থের বিনিময়ে......

কেউ রাজি হবে না রহমান। লক্ষ টাকার বিনিময়েও কোনো ডুবুরী যাবে না কিউকিলার গহ্বরে, বুঝলে?

সর্দার!

আমাকেই তাই যেতে হবে।

সর্দার, আমিই যাবো, আদেশ করুন সর্দার?

রহমান, তুমি পারবে না, কারণ সমুদ্রগর্ভে অবতরণ অভ্যাস তোমার নেই।

সর্দার, আপনারও তো ছিল না, কিন্তু আপনিও সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করেছিলেন?

রহমানের কথায় বনহুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

বনহুর পা বাড়ালো নিজের ক্যাবিনের দিকে।

রহমান তাকে অনুসরণ করলো।

ক্যাবিনের নিকটে যেইমাত্র পৌঁছেছে বনহুর আর রহমান, ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজখানা দুলে উঠলো ভীষণভাবে। কাৎ হতে গিয়ে সোজা হলো তখনই তাই রক্ষা।

একসঙ্গে জাহাজের লোকজন জেগে উঠলো এবং ভয়ার্তভাবে চিৎকার করে উঠলো। সবাই প্রায় বেরিয়ে এসেছে ডেকের উপর, সকলের চোখেমুখেই আতঙ্ক আর উদ্বিগ্নতার ছাপ।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—রহমান, কিউকিলা ঠিক আমাদের জাহাজের তলায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

মুহূর্ত বিলম্ব করো না, আমার সঙ্গে এসো। আলোকরশ্মি মেশিন চালু করতে হবে.....এসো, এসো রহমান.....বনহুর দ্রুত ছুটে চললো জাহাজের সম্মুখ ডেকের দিকে।

রহমান এবং আরও কয়েকজন অনুচর বনহুরকে অনুসরণ করলো। বোরহান তখন জাহাজের বিপদ সংকেতধ্বনি ঘোষণা করে চলেছে।

বনহুর আলোকস্তম্ভ মেশিনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রহমান চিৎকার করে উঠলো! সর্দার, সাবধানে কাজ করবেন! ভুল যেন না হয় সর্দার!

ততক্ষণে কিউকিলা জাহাজের পাশে দৈত্যরাজের মত মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার বিকট জমকালো মাথাটার উপরে আগুনের গোলার মত চোখটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

জাহাজের লোকজন কিউকিলাকে দেখবামাত্র ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলো, যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে লাগলো, কতকগুলো লোক ছুটলো ক্যাবিনের দিকে।

এক দন্ডে সেকি ভয়ঙ্কর এক বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হলো জাহাজখানা দুলছে ভীষণভাবে, যেন এইমাত্র ডুবে যাবে।

বনহুর তখন মারাত্মক আলোকরশ্মি স্তম্ভের মেশিনটা চালু করবার জন্য দক্ষপ্রভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো ওদিক থেকে, বনহুর দেখলো, কিউকিলা তার দক্ষিণ হাতখানা বাড়িয়ে জাহাজের ডেক থেকে পলায়নরত একজন অনুচরকে সে হাতের মুঠায় তুলে নিলো। তীব্র একটা করুন আর্তনাদ ক্ষণিকের জন্য ভেসে এলো বনহুরের কানে।

কিউকিলা লোকটাকে মুখের কাছে তুলে ধরলো, অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝা গেলো লোকটাকে হত্যা করে রক্ত পান করছে দৈত্যরাজ।

বনহুর আলোকরশ্মি স্তম্ভের মেশিনটার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে মেশিনের মুখ কিউকিলার দিকে ফিরিয়ে নিলো।

রহমান তার অনতিদূরে দাঁড়িয়ে সর্দারকে সতর্ক করে দিচ্ছিলো। হঠাৎ যেন কোনো ভুল না হয়। সে জানে, আলোকরশ্মি স্তম্ভের আলো কতখানি মারাত্মক। এতো বিপদ মুহূর্তেও রহমান তার সর্দারকে ছেড়ে কিছুতেই চলে যেতে পারছিলো না। সেও সর্দারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো।

বনহুর তখন কৌশলে আলোকরশ্মির মুখ কিউকিলার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে মুখের আবরণ উন্মোচন যন্ত্রটি টিপে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি নীলাভ তীব্র আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লো কিউকিলার দেহে।

বনহুর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোকরশ্মি স্তম্ভের মেশিনের সুইচ টিপে চললো। স্পীড যতই বাড়িয়ে দিতে লাগলো ততই আলোকরশ্মি সমুদ্র বক্ষে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো। কিউকিলা হাতের মৃতদেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডুব দিলো। আর এক মুহূর্ত সে আলোকরশ্মির সম্মুখে স্থির থাকতে পারলো না।

জাহাজখানা তখন ভয়ানকভাবে দুলছে।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে আলোকরশ্মি স্তম্ভের সুইচ অফ করে দিলো। তারপর মেশিন বন্ধ করে দ্রুত চলে গেলো ক্যাপ্টেন বোরহানের ক্যাবিনে। তখনই জাহাজ ছাড়বার জন্য আদেশ দিলো বনহুর।

বনহুরের নির্দেশমত জাহাজ এবার উত্তর-পশ্চিম দিকে এগুতে লাগলো। স্পীডে জাহাজ চালাবার জন্য আদেশ দিলো সে। কিউকিলা যে স্থানে তলিয়ে গেছে ঐ স্থান ত্যাগ করা তাদের এখন নিতান্ত প্রয়োজন।

বনহুরের দেহে এক উন্মাদনার ছাপ, ঘামে চুপসে গেছে তার সমস্ত জামা-কাপড়। সুন্দর মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে।

একজনকে হারানোর ব্যথা বনহুরের মনে আঘাত করছিলো। না জানি কোন্ ব্যক্তি আজ কিউকিলা হস্তে প্রাণ দিলো। এখনও কেউ জানেনা কে সে হতভাগ্য অনুচর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'শাহী' ঝাঁম সমুদ্রের অদূরে ঝাঁম পর্বতের নিকটে পৌঁছে গেলো। এখানে জাহাজ নোঙর করার জন্য প্রস্তুতি নিলো কিন্তু এখনো তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়—কথাটা জানিয়ে দিলো বনহুর সবাইকে।

সেদিন সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটলো বনহুর এবং তার অনুচরগণের। সতর্কতার সঙ্গে সকলে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে চারদিকে লক্ষ্য রাখলো। বনহুর চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছে। হঠাৎ যদি কিউকিলা এখানে এসে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই, কাজেই পূর্ব হতে প্রস্তুত রইলো সে।

রাত ভোর হয়ে এলো একসময়।

উপস্থিত বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন সকলে কিন্তু প্রত্যেকের মনেই ভয়ানক দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। গত রাতে তারা একজন সঙ্গীকে হারিয়ে একেবারে ভীত হয়ে পড়েছে। ভিতরে ভিতরে সকলে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও প্রকাশ্যে কেউ সাহস পেলো না কারণ জানে তারা, তাদের সর্দার দস্যু বনহুর সাধারণ ব্যক্তি নয়। যদি কোনোক্রমে বুঝতে পারে কেউ তার দলে বিদ্রোহী হয়েছে বা ঐ রকম মনোভাব পোষণ করছে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। তাদের সর্দার যেমন মহৎ তেমনি কঠিন। প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

একবার এক ঘটনা ঘটে ছিলো, বনহুরের অনুচরদের মধ্য হতে একজন বেরিয়ে গিয়ে যোগ দিয়েছিলো অন্য এক দস্যুদলে।

জানতে পেরেছিলো বনহুর, আদেশ দিয়েছিলো রহমানকে—এই মুহূর্তে তোমরা তাকে পাকড়াও করে এনে দাও।

সর্দারের আদেশে রহমান কয়েকজন সঙ্গীসহ বেরিয়ে পড়ছিলো সেই পলাতক অনুচরটির সন্ধানে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অনুচরটিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় তারা। ধরে আনে বনহুরের নিকটে। বনহুর তাকে প্রকাশ্য

দরবারকক্ষে তার অনুচরগণের সম্মুখে কুকুরের মত গুলীকরে হত্যা করেছিলো। এমনি আরও কত হত্যা বনহুর করেছে যা অনুচরদের মনে গভীর এক ভীতির সঞ্চার করেছে।

মনে মনে সবাই কিউকিলার জন্য ভয়াতুর হলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস পেলো না। তবে রহমানকে জানালো তারা সমুদ্রবক্ষে এভাবে আর থাকতে পারবে না।

রহমান তাদের বুঝাতে লাগলো, সর্দার কিউকিলা হত্যা না করে কিছুতেই যাবে না, কাজেই তাদের অপেক্ষা করতেই হবে মৃত্যু হলেও বিমুখ হওয়া চলবে না।

বাধ্য হয়ে নীরব রইলো শাহীর লোকজন।

আবার কয়েকদিন কিউকিলার কোনো আবির্ভাব ঘটলো না। ঝাঁম শহরবাসী কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছে।

মোহন্ত সিন্ধু কন্যাসহ এলেন বনহুরের সঙ্গে দেখা করতে। সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে মালার, কিউকিলা যদি আর না আসে তাহলে দেবরাজকে হারাতে হবে না। মালা পরপর কয়েকদিন শিবের পূজা করে চলেছে তার প্রার্থনা—দেবরাজকে যেন সে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পায়।

মোহন্ত সিন্ধু মালাকে নিয়ে মোটর-বোট যোগে শাহীতে এসে হাজির হলেন।

অভিনন্দন জানালো বনহুর মহারাজ এবং তার কন্যা মালাকে। মালার চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস সে বনহুরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো—দেবরাজ আর কিউকিলা আসবে না। আমি শিবপূজা করে কিউকিলার ধ্বংস কামনা করেছি।

বনহুর অবাক হয়ে তাকালো মালার মুখের দিকে, মালা বলে কি!

বনহুরকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে বললেন মোহন্ত সিন্ধু মালা প্রতিদিন শিবিরে পূজা করে প্রার্থনা জানিয়েছে, কিউকিলাকে তিনি যেন ধ্বংস করে ফেলেন।

হাসলো, বনহুর, মালার সরল মনের পরিচয় পেয়ে সে মুগ্ধ হলো।

ঐ দিন বনহুর সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করবে, কাজেই মোহন্ত সিন্ধু কন্যাসহ 'শাহী' জাহাজে রয়ে গেলেন। ঝাঁম-সর্দার তার দলবল নিয়ে আর একখানা মোটর-বোট নিয়ে হাজির হলো। ডুবুরিগণ আজ সমুদ্রগর্ভে

অবতরণ করবে না বটে কিন্তু বনহুরকে সাহায্য করার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে।

বনহুর ডিনামাইট সংগ্রহ করে ফেলেছে ক'দিনের মধ্যে। একটি নয়-তিনটি ডিনামাইট বসাবে বনহুর সমুদ্র তলে কিউকিলার বাসস্থলে কিন্তু তার পূর্বে তাকে আর একবার সমুদ্রতলে যেতে হবে। কারণ এখনও দৈত্যরাজ কিউকিলার বাসস্থান খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি।

বনহুর একসময় ডিনামাইটগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলো। এমন সময় মালা তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো বনহুর।

মালা বললো—কি করছো দেবরাজ?

ডিনামাইটগুলো পরীক্ষা করে দেখছি।

ডিনামাইট! সে আবার কি দেবরাজ?

বনহুর মালাকে বললো—বসো মালা, তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।

মালা বসলো।

বনহুর নিজে মালার সম্মুখে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলতে লাগলো—মালা, তুমি শিবের পূজা করেছিলে না।

হাঁ, করেছিলাম।

তোমার শিব ঠাকুর এগুলো দিয়েছেন।

অবাক হয়ে বললো মালা—আমার শিব ঠাকুর এগুলো দিয়েছেন—বলো কি?

কেন বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?

শিবঠাকুর যে পাথরের মূর্তি—কি করে এগুলো দেবেন তিনি তোমাকে?

বনহুর ভ্রু জোড়া টান করে একটু হেসে বললো—কেন তোমার শিবঠাকুরের প্রাণ নেই?

মালা খিল খিল করে হেসে উঠলো—পাথরের মূর্তির আবার প্রাণ থাকে নাকি!

বলো কি মালা, শিবের প্রাণ নেই?

না না।

তবে তার পূজো করো কেন তোমরা?

দেবতা, সেজন্য?

যে দেবতার প্রাণ নেই, সে দেবতা কি করে তোমার কিউকিলাকে হত্যা করবে বলো?

দেবতার অদৃশ্য শক্তি আছে, সে শক্তি দ্বারা সে কিউকিলাকে হত্যা করবে।

হেসে উঠলো বনহুর হো হো করে—যে শিবের প্রাণ নেই তার আবার শক্তি আছে না কি? মালা শিবের পূজো করে কোনো ফল হবে না। আমি তোমাদের দৈত্য কিউকিলাকে হত্যা করবো।

না না, তুমি মানুষ হয়ে এমন কাজ পারবে না।

মালা—আমার খোদা আছেন, যার অসীম শক্তি—তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

খোদা! কে খোদা? তোমার কোনো বন্ধু বুঝি?

শুধু আমার নয় সমস্ত পৃথিবীতে যত জীব আছে সবার তিনি বন্ধু।

তোমার সঙ্গে আজ তিনি সমুদ্রবক্ষে নামবেন?

হাঁ নামবেন, তিনি সবসময় আমার সঙ্গে থাকবেন।

বনহুর লক্ষ্য করলো, তার কথায় মালার মুখ দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হয়তো সে ভাবলো, যাক, তার দেবরাজ একা সমুদ্রগর্ভে নামবে না। আশ্বস্ত হলো যেন মালা অনেকটা, বনহুরের কণ্ঠ আবেষ্টন করে ধরলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরের অনুচর ফরিদ সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ফিরে এলো সে—এমনভাবে তার সর্দারের কণ্ঠ মালাকে বেষ্টন করে ধরতে দেখে লজ্জায়-ক্ষোভে গনগন করতে লাগলো। ফিরে গেলো সে রহমানের পাশে।

রহমান ফরিদকে এমনভাবে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে বললো—সর্দারকে বলেছো সব প্রস্তুত।

ফরিদ ঢোক গিলে বললো—রহমান ভাই একটা কথা!

রহমান ফরিদের মুখোভাব লক্ষ্য করে বিস্মিত হলো, বললো—কি কথা বলবি ফরিদ?

এদিকে এসো বলছি।

রহমান হাতের কাজ রেখে উঠে দাঁড়ালো, তার আশেপাশে আরও লোকজন ছিলো কাজেই সে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

ফরিদ চারদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ফিসফিস করে বললো—মালার সাথে সর্দারের প্রেম হয়ে গেছে রহমান ভাই।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো রহমান—প্রেম!

হাঁ মালা আর সর্দারকে একসঙ্গে দেখলাম, শুধু তাই নয় যা দেখলাম বলা চলবেনা, জানো রহমান ভাই---

রহমান তার সর্দারকে জানে, তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে দেখে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরলো ফরিদের গলা।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর আর মালা এসে দাঁড়ালো সেখানে। বনহুর আর মালাকে দেখেই রহমান ফরিদকে মুক্ত করে দিলো।

ফরিদ রহমানের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রীতিমত হাঁপাতে লাগলো,

রহমান একবার তাকালো সর্দারের পাশে দন্ডায়মান মালার দিকে, তারপর সর্দারের মুখে।

বনহুর বললো—কি হয়েছিলো রহমান?

কিছু না সর্দার। বললো রহমান।

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো—ফরিদকে ওভাবে গলা টিপছিলে কেন?

রহমান মাথা চুলকাতে লাগলো।

এমন সময় মোহন্ত সিন্ধু ও ক্যাপ্টেন বোরহান এসে উপস্থিত হলেন।

ততক্ষণে ফরিদ অনেকটা সুস্থ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা আর এমন কি রহমানের কাছে মাঝে মাঝে তারা এমন সাজা পেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই ভুলে গেলো ফরিদ কিছুক্ষণের মধ্যে।

কিন্তু রহমানের মন থেকে মুছে গেলো না ব্যাপারটা, সর্দার সম্বন্ধে এমন উক্তি সে কোনোদিন শুনবে বলে আশা করেনি। মালার প্রতি একটা ক্রুদ্ধভাব জেগে উঠলো তার অন্তরে।

রহমান বনহুরের জন্য ডুবুরীর ড্রেস এবং সমুদ্র তলে নামার জন্য সাজ-সরঞ্জাম গুছাচ্ছিলো।

বনহুর আজ কিউকিলার আবাসস্থল দেখবার জন্য স্বয়ং সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করবে। এরপর যখন সে আবার সমুদ্রতলে নামবে তখন তার সঙ্গে থাকবে ডিনামাইট।

ডুবুরীদ্বয় বনহুরের জন্য ড্রেস এবং আসবাবপত্র পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলো।

মোহন্ত সিন্ধু ক্যাপ্টেন বোরহান আর বনহুর দাঁড়িয়ে দেখছে। বনহুরের কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচরও আছে সেখানে মালা আজ বনহুরের পাশে অতি ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

রহমান কাজ করছিলো আর মাঝে মাঝে আড় নয়নে তাকিয়ে দেখছিলো মালার দিকে। যত রাগ হচ্ছিলো তার রাজা মোহন্ত সিন্ধু ও তাঁর কন্যা মালার উপর। আজ ঝাঁম রাজ্যকে বিপদমুক্ত করতে গিয়ে তাদের সর্দারকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হচ্ছে। না জানি সর্দারের ভাগ্যে কি আছে, কিউকিলা হত্যা করতে গিয়ে নিজেই না নিহত হয়ে বসেন। তারপর মালা এসে সর্দারের গলায় মালার মতই জড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। রহমান নীরবে এসব দেখে গেলেও সহ্য করতে পারছিলো না যেন।

ডুবুরীদ্বয় সব কিছু করে দেখে নিলো। এবার বনহুর এগিয়ে এলো ড্রেস পরার জন্য। বনহুরের দেহ থেকে জামা খুলে ফেলা হলো।

বনহুরের দেহ থেকে বসন উন্মোচন করে ফেলার পর সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলো। এমন কি রহমান বা অন্যান্য অনুচরও এর পূর্বে তারা তাদের সর্দারের দেহ সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় দেখেনি। এতো সুন্দর সুপুরুষ তাদের সর্দার—যেন কল্পনার বাইরে। পৌরুষদীপ্ত। বলিষ্ঠ বাহু, প্রশস্ত লোমশ বক্ষ, গভীর নীল দুটি চোখ, উন্নত নাসিকা—যেন অপূর্ব এক মূর্তি।

মালা নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়েছিলো বনহুরের দিকে! দৃষ্টি সে ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না কিছুতেই। বনহুরের শরীরে তখন ডুবুরীর ড্রেস পরানো হচ্ছিলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বনহুরের ডুবুরি ড্রেস পরা হয়ে গেলো। আজ বনহুর একাই সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করবে।

বনহুর মোটর-বোটে নেমে আসার পূর্বে নিজের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো, তুলে করে নিলো ওয়্যারলেসটা। বনহুর ইচ্ছা করেই তার বাজুবন্ধের ক্ষুদে ওয়্যারলেসটা খুলে রাখে আজকাল। কারণ নূরীর লকেটে তার কণ্ঠস্বর ধরা পড়ে যে-কোনো মুহূর্তে—আর নূরী তাকে বিরক্ত করে সর্বক্ষণ।

ওয়্যারলেসে বনহুর নূরীর সঙ্গে আলাপ করে নেয় কিছুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে আসে ক্যাবিন থেকে।

বনহুর এবার জাহাজ 'শাহী' থেকে মোটর বোটে নেমে বসলো। আজও মোহন্ত সিন্ধু ও তাঁর কন্যা মালা বনহুরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো 'শাহীর ডেকে দাঁড়িয়ে।

বনহুরের মোটর বোটে দু'জন ডুবুরী দু'জন বনহুরের অনুচর আর রইলো রহমান। ওয়্যারলেস যন্ত্র, বাইনোকুলার , অক্সিজেন পাইপও রয়েছে। জাহাজের নিকট হতে যতই বনহুরের বোটখানা সমুদ্র বক্ষে সরে যাচ্ছে

ততই মালার মুখ বিষন্ন মলিন হয়ে আসছে, হাত নাড়ছে মালা এবং মোহন্ত সিন্ধুর।

বোটে দাঁড়িয়ে বনহুরও হাত নাড়ছে।

কে জানে এই তার শেষ বিদায় কি না!

❑

গভীর সমুদ্রতলে আজ বনহুর সম্পূর্ণ একা।

জীবননাশের ভয়ে আতঙ্কিত ডুবুরীদ্বয় লক্ষ টাকার বিনিময়েও কিউকিলার আবাসস্থলের সন্ধানে সমুদ্রগর্ভে নামতে রাজি হয়নি।

বনহুর অবশ্য ইচ্ছা করলে ডুবুরীদ্বয়কে সঙ্গী করে নিতে পারতো তার বজ্র কঠিন কণ্ঠস্বর বাধ্য করতো ওদেরকে কিন্তু বনহুর ইচ্ছা করেই ডুবুরীদ্বয়কে ক্ষমা করে দিয়েছে, কারণ সে জানে ওরা যা ভয় পেয়েছে সেটা সত্যও হতে পারে, মৃত্যু ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাই ডুবুরীদ্বয়কে আজ না নিয়ে একাই সে অবতরণ করেছে সমুদ্রগর্ভে।

যতই গভীর জলের তলে নেমে চলেছে বনহুর ততই আরও বিস্মিত হচ্ছে। জীবনে সে বহু কিছু দেখেছে কিন্তু এমন আশ্চর্য বস্তু এবং জীব দেখেনি; কতরকম মাছ, কতরকম কাঁকড়া, শামুক, হাঙ্গর, কুমীর তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বনহুর চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছে, লক্ষ্য করছে দূরে অনেক দূরে—উদ্দেশ্য-কিউকিলার আবাসস্থল খুঁজে বের করা।

সাঁতার কেটে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বনহুর, তার কোমরের বেল্টে সুতীক্ষ্নধার ছোরা, একটি নয় কয়েকটি। একটি ছোরা সবসময় তার হাতের মুঠায় রয়েছে।

ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে এতোক্ষণ একটি জীবও তাকে আক্রমণ করেনি বা তার সম্মুখে এসে পড়েনি। সমুদ্রতলে নানা জাতীয় জলীয় উদ্ভিদ, বড় বড় পাথরখন্ড আর নানারকম সেগুলো নজরে পড়ছে। কোথাও বা পাহাড়ের মত উঁচু-নীচু ঢিবি। এক একটা ঢিবি প্রায় তিন-চার তলা বাড়ির সমান উঁচু। বনহুর দূর থেকে এই সব ঢিবির উপর লক্ষ্য রেখে এগুতে লাগলো।

কত ফিট নীচে নেমেছে বনহুর মিটারে দেখে নিলো। চমকে উঠলো সে, এতো নীচে গভীর সমুদ্রতলে কোনো ডুবুরী নামতেও সাহসী হবে না। বনহুরের বুক এতোটুকু কাঁপলো না বা সে বিচলিত হলো না। বাইনোকুলার

চোখে দিয়ে সমুদ্রতল নিরীক্ষণ করে চললো! ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে এগুচ্ছে বনহুর। একস্থানে নজরে পড়লো, কি সুন্দর ফুলের মত কতকগুলো জলীয় উদ্ভিদ গভীর জলের তলায় রূপালী গাছের মত ঝকমক করছে। কতকগুলো বরফের ফুলের মত সাদা ধপ ধপে। মুগ্ধ হয়ে গেলো সে, এতো মনোমুগ্ধকর জলীয় উদ্ভিদ বনহুর কোনোদিন দেখেনি। বৈচিত্রময় পৃথিবীর অভ্যন্তরেও রয়েছে কত বিচিত্র রূপধারা। ইচ্ছা হলো এই উদ্ভিদগুলো সে তুলে নেয়, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো তার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় এ নয়।

বনহুর ভেসে উঠলো কয়েক ফিট উপরে, দিকদর্শন যন্ত্রে লক্ষ্য করে দেখে নিলো এখন সে কোন্ দিকে এগুচ্ছে। বনহুরের ড্রেসের সঙ্গেই ছিলো সবরকম জলীয় যন্ত্রপাতি। যাতে তার কোনোরকম অসুবিধা না হয়।

কিছুটা অগ্রসর হতেই একটা বিরাট অজগর ভেসে এলো তার দিকে। সে কি ভয়ঙ্কর আর মস্ত বড় দেহ। এবার বনহুর ভয় পেলো, শিউরে উঠলো সে। মস্ত বড় হা করে এগিয়ে আসছে। অজগরের চোখ দুটো যেন টর্চলাইটের বাল্‌বের মত জ্বলছে।

গভীর জলের তলায় না হলে বনহুর এতোখানি ঘাবড়ে যেতো না কিন্তু এখন তার ভাববার সময় নেই। বনহুর ছোরাখানা বাগিয়ে ধরে প্রস্তুত হয়ে নিলো, এক মুহূর্ত বিলম্ব হলে সর্পরাজ তাকে গ্রাস করে ফেলবে।

যদিও বনহুরের হাতে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা ছিলো তবু অজগরটিকে লক্ষ্য করে বনহুর ভীত হলো। এবার অজগরের কবল থেকে তার রক্ষা নেই, বুঝতে পারলো সে। বনহুর সাঁতার কেটে অজগরের লক্ষ্যের বাইরে যাওয়ার জন্য দ্রুত সরে যেতে লাগলো, কিন্তু সর্পরাজ তার বিপুল বিরাট দেহ নিয়ে আঁকা বাঁকা হয়ে তীরবেগে ভেসে আসছে।

বনহুর মরিয়া হয়ে সাঁতার কাটছে, অসীম জলরাশি ঠেলে প্রাণ পণে অজগরের দৃষ্টির আড়ালে সরে যাবার চেষ্টা করছে সে। আর বুঝি বাঁচতে পারলো না, ক্রমান্বয়ে হাত পা কেমন অবশ হয়ে আসছে তার। শিথিল হয়ে আসছে তার বাহু দুটি। এতোক্ষণ দক্ষ সাঁতারুর মত সাঁতার কেটে এগুচ্ছিলো, হঠাৎ তার শরীরের সঙ্গে কি যেন জড়িয়ে গেলো। বনহুর লক্ষ্য করতেই ভয়ে আড়ষ্ট হলো, জলীয় উদ্ভিদের শিকড়ের সঙ্গে আটকে পড়েছে তার দেহটা।

বনহুর এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো, অজগর সাপটা ভেসে ভেসে আসছে। তার বিরাট হার মধ্যে খাঁড়ার মত তীক্ষ্ণ দুটি দাঁত আর তরবারির মত লক লকে জিহ্বা। বনহুর বিমর্ষ মুখে তাকালো সর্প রাজের দিকে। সমস্ত দেহ তখন তার জলীয় উদ্ভিদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে মাকড়সার জালের মত।

ডুবুরীর ড্রেসের মধ্যেও বনহুরের শরীর ঘেমে উঠেছে, ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছো তার মুখমন্ডল। দক্ষিণ হস্তের ছোরাখানা এটে ধরে হাঁপাচ্ছে সে।

বনহুর এবার ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো। গভীর সমুদ্র বক্ষে আজ তার এইভাবে মৃত্যু ছিলো কে জানতো।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছে বনহুরের অনুচরগণ আর মহারাজা মোহন্ত সিন্ধু ও তাঁর কন্যা মালা।

বোটের উপরে রহমান ও ডুবুরীদ্বয় আতঙ্কভরা হৃদয় নিয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা জানে না, তাদের সর্দার এই মুহূর্তে সমুদ্রতলে কি অবস্থায় রয়েছে।

বনহুর নিজের শরীর থেকে জলীয় উদ্ভিদের শিকড়গুলো ছাড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করলো না; কারণ সে বুঝতে পেরেছে, চেষ্টা করে কোনো ফল হবে না। হাত পা অবশ হয়ে এলো বনহুরের—নিজকে প্রস্তুত করলো সর্পরাজের উদরে প্রবেশের জন্য।

সত্যি এ দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর!

দস্যু বনহুর আজ ঝাঁম সমুদ্রের তলদেশে একটি সর্পরাজের উদর পূর্ণ হতে চলেছে। তার মাত্র কয়েক হাত দূরে—এসে পড়েছে সর্পরাজ।

বনহুর একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে নিলো। চোখের সম্মুখে ঝরে পড়লো সহস্র ফুলঝুরি। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো সে প্রাণপনে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুরের দেহে জলতরঙ্গের প্রচন্ড আঘাত এসে লাগলো। ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠলো তার দেহটা। তবে কি সর্পরাজ তার দেহটাকে ভক্ষণ করে ফেললো। বনহুর অতি কষ্টে আবার চোখ মেলে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলো, বিরাট একটা তিমি মাছের সঙ্গে সর্পরাজের যুদ্ধ বেঁধে গেছে।

সর্পরাজ এগিয়ে আসছিলো, প্রায় বনহুরের কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময় একটা তিমি আচমকা আক্রমণ করে বসেছে সর্পরাজকে।

মৎস্যরাজ সর্পরাজের লেজের দিকে প্রায় অর্ধেকটা গিলে ফেলেছে। বাকি অর্ধেকটা নিয়ে ভীষণ তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে সর্পরাজ।

অজগরের শিকার হলো দস্যু বনহুর।

আর তিমি মাছটার শিকার হলো অজগর। তিমির মুখ-গহ্বর থেকে অজগর প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মৎস্যরাজ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, সে কিছুতেই সর্পরাজকে ছেড়ে দেবে না, ভীষণ যুদ্ধ চলেছে দু'জনার মধ্যে।

বনহুর খোদার কাছে প্রাণ ভরে শুকরিয়া করে নিলো। আর মুহূর্ত বিলম্ব করলো না সে, দ্রুতহস্তে কেটে ফেলতে লাগলো নিজের দেহের শিকড়গুলো। এতোক্ষণে আবার যেন সে ফিরে পেয়েছে পূর্ব শক্তি, সজীব হয়ে উঠেছে তার অসাড় দেহটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুর জলীয় উদ্ভিদের আঠালো শিকড় থেকে নিজকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হলো।

একবার বনহুর তাকিয়ে দেখলো, তিমি মৎসের উদরে অজগরের দেহের তিন ভাগ অংশ প্রবেশ করেছে। অজগরটা মরিয়া হয়ে বার বার হা করছে। নিজকে রক্ষা করার জন্য সে কি আকুলতা। একটু পূর্বে স্বয়ং দস্যু রাজের যে অবস্থা হয়েছিলো ঠিক সেই অবস্থায় পড়েছে সর্পরাজ।

বনহুর আর বিলম্ব না করে অতিদ্রুত সাঁতার দিয়ে ভেসে উঠার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে এখন হাজার হাজার ফিট গভীর জলের তলায় রয়েছে।

তবু আপ্রাণ চেষ্টায় তিমিটার দৃষ্টির আড়ালে সরে যেতে প্রয়াস নিচ্ছিলো সে।

বনহুরের ডুবুরী ড্রেসের সঙ্গে ছিলো দ্রুত সাঁতার কাটার অদ্ভুত যন্ত্র। যার দ্বারা বনহুর গভীর জলের তলে অনায়াসে সাঁতার কাটতে সক্ষম হচ্ছিলো। বনহুর সেই সাতারু যন্ত্রের দ্বারা কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক দূরে এসে পড়লো।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি পথ রোধ হয়ে গেলো যেন। বিরাট একটা পাহাড় তার সম্মুখে দেখতে পেলো সে। উঁচু-নীচু স্থানে স্থানে গর্তের মত গোল ছিদ্রপথ রয়েছে! নানা রকম মাছ ঝাক ঝাক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গর্তের মধ্যে এবং আশে পাশে। বড় বড় চাঁদা মাছও রয়েছে, প্রায় এক একটা বিশ পঁচিশ হাত প্রশস্ত, দেহটা রুপালী কানগুলো ঠিক সোনালী পর্দার মত।

বনহুরকে দেখে মাছগুলো ছুটে ছুটে পালাতে লাগলো। আর কত রকম মাছ, ছোট বড় নানা রকমের। পাহাড়টার গায়ে সেঁওলা জাতীয় উদ্ভিদ রয়েছে মাছগুলো সেইসব সেঁওলা খাচ্ছিলো।

বনহুর ডুবন্ত পাহাড়ের উঁচু নীচু গা বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো। সুন্দর মনোমুগ্ধকর রং বেরং এর মাছ তার পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো। কতরকম ঝিনুক—সোনালী-রূপালী-হলদে। কতকগুলো ঠিক ফুলের মত দেখতে। বনহুর কয়েকটা সুন্দর ঝিনুক তার পোশাকের পকেটে তুলে নিলো। ছোট ছোট ফুলের কুঁড়ির মত ঝিনুকগুলো থেকে একরকম নীলাভো আলো ঠিকরে বের হচ্ছিলো। বনহুর বুঝতে পারলো, এসব ঝিনুক থেকেই ডুবুরিগণ উজ্জ্বল মুক্তা উদ্ধার করে থাকে।

আপন মনে এগুচ্ছে বনহুর। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো দূরে, একটা ফাটলের মত বড় গর্তের মধ্যে জমকালো কিছু নজরে পড়লো। বনহুর সাঁতার কাটা বন্ধ করে চুপ হয়ে দাঁড়ালো, বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো, বনহুরের নিকট থেকে অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ গজ দূরে ডুবন্ত পাহাড়টার গায়ে সেই বিরাট ফাটল। বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে সম্মুখে দৃষ্টি ফেলতেই স্তম্ভিত বিস্মিত হলো বনহুর, বিরাট ফাটলটার ভিতরে একটা বিরাট দেহ গুটি শুটি মেরে শুয়ে আছে। তবে কি সেই জলদানব কিউকিলা। বনহুরের মন আশায়-আনন্দে নেচে উঠলো, মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য আরও কিছুটা অগ্রসর হলো সে। এবার অতি ধীরে লঘুভাবে সাঁতার কাটছে বনহুর। তার চোখেমুখে বিপুল উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে। কিছুটা অগ্রসর হতেই বনহুর আপন মনেই অস্ফুট শব্দ করলো, এটাই কিউকিলা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর আর বিলম্ব না করে উপরের দিকে সাঁতার কেটে ভেসে উঠতে লাগলো। সাঁতারু মেশিনের স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে বনহুর। ঘড়িতে দেখে নিলো, পুরো তেরো ঘন্টা সে সমুদ্রবক্ষে গভীর জলের তলায় ছিলো।

বনহুর যখন সমুদ্রতল হতে উপরে ভেসে উঠলো তখন মোটর বোটখানা তার নিকট হতে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে ছিলো। রহমানের চোখে ছিলো দূরবীক্ষণ যন্ত্র, সে চারদিকে ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে অন্বেষণ করে ফিরছিলো। এতোক্ষণও সর্দারকে ফিরে আসতে না দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো রহমান ও তার দলবল।

জাহাজ 'শাহী'তেও মোহন্তসিন্ধু ও মালা ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করছে—না জানি সমুদ্রগর্ভে দেবরাজ এখন কি করছে। ক্যাপ্টেন বোরহান এবং বনহুরের অন্যান্য অনুচর সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, সমুদ্রগর্ভে এতো বিলম্ব হচ্ছে কেন? তবে কি কিউকিলার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে?

রহমান বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছে, সে বোটের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সর্বক্ষণ সমুদ্রবক্ষে নজর রেখেছে, কখন কোথায় ভেসে উঠবে। কোনো মহূর্তে সে বিশ্রাম গ্রহণ করেনি। সর্দারকে বিদায় দেবার পর থেকে সবসময় উদ্বিগ্ন চিত্ত নিয়ে প্রতীক্ষা করছে—কখন তার আবির্ভাব ঘটবে।

বনহুর যখন সমুদ্রবক্ষে ভেসে উঠলো তখন জাহাজ এবং মোটর বোটখানা তার নিকট হতে বহুদূরে। জাহাজ ও মোটরবোট থেকে কেউ তাকে দেখতে পেলো না।

সাঁতার কেটে এগুচ্ছে বনহুর। যদিও তার ড্রেসের সঙ্গে সাঁতার কাটার জন্য সহজ স্পীড মেশিন ফিট করা ছিলো তবু সমুদ্রতলে অক্সিজেন নিয়ে বহুক্ষণ কাটানোর দরুণ বনহুর বেশ নার্ভাস বোধ করছিলো।

সমুদ্রবক্ষে ভেসে উঠার পর প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেলো তবু সন্ধান নেই কারো। 'শাহী' জাহাজখানা তো এখন বহুদূরে। রহমান মোটরবোট নিয়ে চারদিকে খুঁজে ফিরছে, কিন্তু যেখানে বনহুর সাঁতার কেটে এগুচ্ছে সেখানে কেউ সন্ধান পায়নি এখনও।

মোহন্ত সিন্ধু ও মালা 'শাহী' থেকে নেমে এসেছে দ্বিতীয় একটি মোটরবোটে। তারাও উদ্বিগ্ন হৃদয় নিয়ে খুঁজে ফিরছে দেবরাজকে। মালা তো প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়েছে, তার মুখে একটা দুশ্চিন্তার চাপ পড়েছে না জানি সমুদ্রতলে তার কি হলো।

মালাও চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে চারদিকে দেখছে। মনের মধ্যে ঝড় বইছে যেন ওর, দেবরাজকে না পেলে ও যেন বাঁচবে না!

মালার আঁচলখানা বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে কাঁধে, পিঠে, ঘাড়ে, চোখে, মুখে। করুণ বিষণ্ন মুখমন্ডল, চোখে ব্যাকুল চাহনি। ঠোঁট দুটো সমুদ্রের উষ্ণ বাতাসে শুকিয়ে উঠেছে চটচটে হয়ে। বৃদ্ধ মোহন্ত সিন্ধুর চোখমুখেও আশঙ্কার ছাপ ফুটে উঠেছে।

রহমানের বোটের সঙ্গে মিলিত হলো মোহন্ত সিন্ধুর মোটর বোটখানা। উভয় বোটের আরোহীই যখন বনহুরের সন্ধান লাভে বিমুখ হয়ে পড়েছে তখন হঠাৎ মালার বাইনোকুলারে ধরা পড়লো, দূরে অনেক দূরে বনহুর সাঁতার কেটে আসছে।

মালা আনন্দধ্বনি করে উঠলো—বাবা ঐ দেখো দেবরাজকে দেখা যাচ্ছে।

বলো কি মালা?

হাঁ বাবা। মালা নিজ হস্তে পিতার চোখে বাইনোকুলার ধরলো।

রহমানও দেখলো মালা ঠিকই বলেছে, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল। আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে বনহুরের দিকে মোটর বোটের মুখ ফিরিয়ে ষ্টার্ট দিলো।

মালাও তার বোটের চালককে রহমানের বোটখানাকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিলো। দু'খানা বোট স্পীডে এগিয়ে চললো। উত্তাল তরঙ্গের ফেনিল জলরাশির বুকে বোট দু'খানা যেন পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বনহুরও সাঁতার কেটে এগুচ্ছিলো, কিছুক্ষণেই রহমান এবং মোহন্ত সিন্ধুর বোট পৌঁছে গেলো তার পাশে! রহমানও তার সঙ্গী ডুবুরীদ্বয় বনহুরকে তুলে নিলো।

মোহন্ত সিন্ধু ও মালা দ্বিতীয় বোট থেকে নেমে এলো রহমানের বোটে। তারপর জাহাজে ফিরে এলো সবাই মিলে। আবার জাহাজে আনন্দ উৎসব বয়ে চললো।

বনহুরের অনুচরগণ সর্দারকে ফিরে পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। রাজা মোহন্ত সিন্ধুর আনন্দ যেন ধরছে না। মালাতো কি বলে বনহুরকে অভিনন্দন জানাবে তার ঠিক নেই। সে বনহুরকে কাছে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনলো পুনরায় বনহুরকে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করতে হচ্ছে, তখন সে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো। বনহুর আর বিলম্ব করতে রাজি নয়, সে কিউকিলার আবাসস্থল আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। তখনই প্রস্তুত হয়ে নেবার জন্য রহমানকে ডিনামাইটগুলো আনতে আদেশ করলো।

বনহুর কিভাবে ডিনামাইট বসাবে এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মিঃ ফিরার্ড এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিলো কিছুক্ষণ। একটি নয় তিনটি ডিনামাইট বসাতে হবে। কারণ একটি দিয়ে কিউকিলার আবাসস্থল ডুবন্ত পাহাড়টা ধ্বংস নাও হতে পারে। কিউকিলা যদি আহত হয় তাহলে সে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সংক্ষেপে বনহুর সমস্ত কথাই প্রকাশ করলো তার প্রধান অনুচর রহমান, রাজা মোহন্ত সিন্ধু এবং অন্যান্য সকলের নিকটে। মালাতো শুনে ভয়ে

থরথর করে কাঁপতে লাগলো। বনহুরের অনুচরগণ ভয় প্রকাশ না করলেও ভিতরে ভিতরে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো, শিউরে উঠলো তাদের দস্যুপ্রাণ।

মোহন্ত সিন্ধুর মুখমন্ডল বিবর্ণ-ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। তিনি যেন এসব কল্পনাই করতে পারেন না। সাগরতলে যে এমন সব ভয়ঙ্কর জীব বাস করে তাও যেন তাঁর চিন্তার বাইরে।

মোহন্ত সিন্ধু সব শোনার পর ভয়াতুর কণ্ঠে বললেন—কিউকিলা আমার সব ধ্বংস করুক তবু আমি তোমাকে আর যেতে দেবো না দেবরাজ। অমন ভয়ঙ্কর স্থানে গেলে আর তুমি ফিরে আসবে না।

বনহুর মৃদু হেসে বললো—মহারাজ, আপনি দেশের রাজা। আপনার মুখে সাজে না এমন কথা। আজ ঝাঁম রাজ্যের প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর সম্মুখীন। আপনার নিজ জীবনেরও বিশ্বাস নেই মহারাজ।

তবু—তবু তোমার মত একটি ছেলেকে হারাতে মন আমার চায় না দেবরাজ।

মোহন্ত সিন্ধু আর বনহুরের মধ্যে যখন এই কথাবার্তা চলছিলো তখন রহমান ডিনামাইট নিয়ে আসে। সে নিজেও সর্দারকে মৃত্যুগুহায় পাঠাতে রাজি নয় কিন্তু রহমান জানে, কোনো বাধাই সর্দারকে তার কার্য থেকে ক্ষান্ত করতে সক্ষম হবে না; কারণ সে জানে, কিউকিলা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকাকালে তার বাসস্থানের ভিতরে ডিনামাইট বসাতে হবে। হঠাৎ জেগে উঠলে ডিনামাইট বসানো তো দূরের কথা—মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিউকিলাকে বনহুর ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে এসেছে, তার ঘুম ভাঙ্গবার পূর্বেই তাকে কাজ সমাধা করতে হবে।

বনহুর তার ডুবুরী ড্রেসের ভিতরে ডিনামাইট নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলো। প্রত্যেকটা ডিনামাইটের সঙ্গে থাকবে ইলেকট্রিক তারের সংযোগ, সুইচ থাকবে জাহাজে। বনহুর ডিনামাইটটি ফিট করে ফিরে আসার পর সুইচ টিপে দিলেই ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটবে। সঙ্গে ধ্বংস হবে কিউকিলার বিরাট দেহটা।

সকলের বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে বনহুর সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করলো। 'শাহী' জাহাজ এবং কয়েকখানা মোটারবোট বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো সমুদ্রবক্ষে। বনহুরের বিশ্বস্ত অনুচরগণের প্রত্যেকের চোখেমুখেই আজ এক বিপুল উন্মাদনার ছাপ। সর্দার গভীর জলের তলদেশে যমদূতকে হত্যা

করতে চলছে। ঝাঁমবাসীদের রক্ষা করার জন্য তার এ অসীম প্রচেষ্টা। কে জানে তার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে কি না।

ক্রমান্বয়ে বনহুর নেমে চলেছে নিচের দিকে। মিটারে দেখে নিচ্ছে কত ফিট জলের তলায় এখন সে আছে। বনহুরের কভারে ঢাকা মুখমন্ডলে কঠিন কর্তব্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। যেমন করে হোক তাকে কার্যোদ্ধার করতেই হবে।

যতই গভীর জলমধ্যে নেমে আসছে ততই বনহুর নিজকে কঠিন সংযত করে নিচ্ছে, মৃত্যুকে যেন জয় করতে পারে। তার চারপাশ কেটে চলে যাচ্ছে কতরকম মাছ, কতরকম জলজীব। তাকে দেখে জলজীবগুলো আশ্চর্য হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটছে—হয়তো ভাবছে, সেও তাদেরই একজন! কতকগুলো ছোট মাছ ঝাঁক ধরে এগিয়ে আসছিলো, বনহুরকে দেখামাত্র ছুটে পালিয়ে গেলো। হয়তো তাকে ভয়ঙ্কর কোনো শত্রু মনে করে থাকবে ওরা।

বনহুর আপন মনে হাসলো।

আজ বনহুর সাবধানে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। তার পিঠে বাঁধা স্পীড মেশিনটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ। সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রায় বিশ ফুট উঁচু দিয়ে এগুচ্ছে বনহুর। নানা জাতীয় জলীয় উদ্ভিদ এড়িয়ে ডুবন্ত ছোট ছোট পাহাড়গুলোর মাথার উপর দিয়ে সাঁতার কেটে চলেছে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত জীব এসে তার পথরোধ করলো। বনহুর এরকম জীব দেখেনি কোনোদিন, নামও জানে না। জীবটা ঠিক গোল ফুটবলের মত কিন্তু আকারে অনেক বড় প্রায় ফুটবলের চেয়ে দু'শ গুণ বড় হবে। গোলাকার জীবটার দেহে কোনোরকম হাত-পা বা লেজ নেই, নেই কোনো মাথার চিহ্ন। দেহটার সম্মুখভাগে মার্বেলের মত ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো চোখ, চিংড়ি মাছের চোখের মত খানিকটা উঁচু হয়ে বেরিয়ে এসেছে যেন। চোখ দুটোর নিচে বিরাট একটা কাটা রেখার মত কিছু। বনহুর আরও আশ্চর্য হলো—মাঝে মাঝে কাটা রেখাটা ফাঁক হয়ে করাতের মত দু'পাটী দাঁত বেরিয়ে আসছে। বুঝতে পারলো বনহুর ঐ ফাঁকটাই হলো অদ্ভুত জীবটার মুখগহ্বর।

থমকে স্থির হয়ে পড়লো বনহুর। অদ্ভুত জীবটা পানির মধ্যে ভেসে ভেসে এগিয়ে আসছে। যেন গ্যাসভরা একটা বেলুন আর কি।

বনহুর আরও গভীর অতলে তলিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। বেলুনটা যেন তার দিকেই গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। সর্বনাশ নর খাদক জীব নাকি ওটা! ভাবলো বনহুর মনে মনে। দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানার দিকে তাকিয়ে নিরাশ হলো, এটা দিয়ে কিছু হবে না ঐ বিরাট ফুটবলটার। হয়তো সামান্য ফুটোর সৃষ্টি হবে মাত্র তার শরীরে।

বনহুর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো ফুটবল আকারের জীবটার কবল থেকে কি করে বাঁচবে। সে যতই নিচে নেমে যাচ্ছে ফুটবলটাও তাকে অনুসরণ করছে।

একি বিপদ! এবার বুঝি এই অদ্ভুত জীবের মুখগহ্বরে নিজকে সমর্পণ করতে হয়। বনহুর যখন অত্যন্ত দ্রুত নিজকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে তখন ফুটবলটাও তার গতি বাড়িয়ে দিলো। হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর ফুটবলটির পেটের মধ্যে কেমন যেন শব্দ হচ্ছে শুনতে পেলো সে। ঠিক কোনো মেশিনের শব্দের মতই লাগলো তার কানে।

বনহুর বিস্মিত হয়ে পড়েছে, এ আবার কি ধরনের জীব কে জানে। বনহুর যতই পালাচ্ছে গোলকার জীবটা ততই তাকে অনুসরণ করছে।

মরিয়া হয়ে উঠলো বনহুর। সে আরও লক্ষ্য করলো, বড় বড় হাঙ্গর কুমীরগুলো পর্যন্ত গোলাকার জীবটাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এবার নিজের জীবনের আশা ত্যাগ করে ফেললো বনহুর। অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছে অক্সিজেন পাইপ ঠিকমত কাজ করতে পারছে না আর। স্পীড মেশিনের গতি ও ফুটবল আকার জীবটার গতির কাছে হ্রাস হয়ে এসেছে। মৃত্যু, এবার সত্যিই মৃত্যু দস্যু বনহুরের।

তবু শেষ চেষ্টা করছে বনহুর। তার সাঁতারের মেশিনের গতি ডবল বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে তো মানুষ—কতক্ষণ এভাবে একটানা সাঁতার কাটতে পারে। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে বনহুরের।

ফুটবলটা একেবারে অতি নিকটে এসে পড়েছে। হা করছে বার বার আর কেমন যেন একটা বিকট শব্দ করছে যন্ত্রের আওয়াজের মত।

হঠাৎ বনহুর ধাক্কা খেলো যেন কিসের সঙ্গে। তাকিয়ে দেখলো, একেবারে সেই পাহাড়টার গায়ে এসে আটকে পড়েছে। শিউরে উঠলো—এটা সেই ডুবন্ত পাহাড়, যে পাহাড়ের ফাটলে নিদ্রিত আছে ভয়ঙ্কর দৈত্যরাজ কিউকিলা।

বনহুর নিজের আশা ত্যাগ করলো, সম্মুখে এগিয়ে আসছে অদ্ভুত জীব ফুটবল -পিছনে কিউকিলা। বনহুর আর এগুতে পারলো না, পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

গোলাকার জীবটা তখন পাশে এসে পড়েছে, একেবারে চোখের সম্মুখে। বনহুর তাকিয়ে দেখলো, ঠিক একটা বড় লৌহগোলক যেন। চোখ মুদলো বনহুর তার দৃষ্টির সম্মুখে নেমে এলো রং-এর ফুলঝুরি।

কিন্তু একি! বনহুরকে জীবটা তো গ্রাস করলো না। কেমন যেন আওয়াজ হচ্ছিলো, এবার ঘটং করে একটা শব্দ হলো সঙ্গে সঙ্গে বনহুর চোখ মেলে তাকালো। বিস্ময়ে হতবাক স্তম্ভিত হলো বনহুর দেখলো এতোক্ষণ যে গোলাকার ফুটবলটাকে সে ভয়ঙ্কর কোনো জীব বলে ধারণা করেছিলো আসলে সেটা কোনো জীব নয়—একটা ডুবন্ত জলযান। গোলকার ঢাকনা খুলে বেরিয়ে এলো দু'জন মানুষ। লোক দু'জনার দেহে অদ্ভুত ড্রেস। ঠিক ডুবুরী ড্রেসের মতই কতটা দেখতে। বনহুরকে দু'জন ধরে ফেললো দু'পাশ থেকে। বনহুর লোক দুটির মুখ দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলো তারা সভ্য মানুষ।

বাধা দিলো না বনহুর ওদের, তার মনে তখন বিপুল জানার বাসনা, কে এরা, কিই বা তাদের উদ্দেশ্য। বনহুর নিজকে সমর্পণ করলো লোক দুটির হাতে।

এবার বনহুরের আরও আশ্চর্য হবার পালা, লোক দুটি বনহুরকে নিয়ে গোলাকার জলযানটার পাশে এগিয়ে এলো। একজন জলযানটার পাশের কোনো সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা খুলে গেলো।

বনহুরকে নিয়ে ওরা প্রবেশ করলো ভিতরে। বনহুর হতবাক হয়ে দেখলো, অদ্ভুত ফুটবলের মত জলযানটার ভিতরটা সুন্দর একটা মোটর কারের মত দেখতে। পাশাপাশি বসবার দুটো আসন পিছনে, আর সম্মুখে একটি আসন এটি বোধ হয় চালকের ড্রাইভিং আসন হবে। মোটরগাড়ি হ্যান্ডেলের মতই একটা গোল হ্যান্ডেল। পাশেই মিটার মেশিন, মাডগার্ড ও আরও অনেকরকম যন্ত্রপাতি নজরে পড়লো বনহুরের।

বনহুরকে পিছন আসনে বসিয়ে দিয়ে একজন তার পাশে বসে পড়লো আর একজন সম্মুখে ড্রাইভ আসনে বসে পড়েছে। ভিতরে প্রবেশ করার সময় এক বিন্দু জলও প্রবেশ করেনি জলযানটার মধ্যে। বনহুর নিশ্চুপ বসে ওদের কার্যকলাপ দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ পূর্বে জলজীব ভ্রমে যার কবল থেকে

রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো, এখানে তার উদরে এভাবে আয়েসে বসে থাকবে সে ভাবতে পারেনি।

বনহুরের দেহে ডুবুরী ড্রেস তখনও পরা রয়েছে।

লোক দুটো তাদের মুখের অদ্ভুত আবরণ উন্মোচন করে ফেললো। বিস্মিত হলো বনহুর—উভয়েই সভ্য জগতের সুষ্ঠু মানুষ—তবে এরা ঝাঁমবাসী নয়—কোন্ দেশের লোক সহজে বুঝা গেলো না।

সঙ্গীকে লক্ষ্য করে সামনের লোকটা খাঁটি ইংরেজীতে বললো—ওর মুখের আবরণ উন্মোচন করতে বলো স্ময়ং।

বনহুর অবাক হলো, এরা তবে সভ্য মানুষ—সুন্দর ইংরাজী বলছে। তার পাশে বসা লোকটার নাম স্মিয়ং। লোকটা কি বলে শুনবার জন্য অপেক্ষা করলো বনহুর।

লোকটা এবার বনহুরকে তার মুখের অক্সিজেন পাইপসহ মুখোশ খুলে ফেলার জন্য বললো। সেও ভাল শুদ্ধ ইংরাজী বলছে।

বনহুর খুলে ফেললো নিজের মুখের মুখোশ। সঙ্গে সঙ্গে আরও অবাক হলো, জলযানটার মধ্যে অক্সিজেন তো রয়েছেই এয়্যারকন্ডিশনিং এর সুন্দর ব্যবস্থা আছে। রক্তাভ একটা আলো জ্বলছে ভিতরে, সেই আলোতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ভিতরটা এবং সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বনহুর।

স্মিয়ং প্রথম ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললো—আর্লিং স্মিথ, একে নিয়ে এখন কোথায় যাবে?

আলিং স্মিথ জলযানটা চালনা করছিলো, ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলো—আমাদের দলপতির কাছে নিয়ে যাবো একে।

বনহুর ওদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলো, এরা কোনো গ্যাং বা দল নিয়ে কোথাও বাস করছে। কিন্তু কোথায় তাদের সেই ঘাটি, যেখানে রয়েছে এদের দলপতি। নিশ্চুপ বসে রইলো বনহুর। কিউকিলা হত্যা করতে এসে একি বিভ্রাটে পড়লো।

এবার ফুটবলটা যেন দক্ষ খেলোয়াড়ের পায়ে শট করা বলের মতই সা-সা করে ছুটতে লাগলো। বনহুর ভাবতেও পারেনি, এই গোলক পিন্ডটা জীব নয়-একটি জলযান এবং শত শত ফিট, গভীর জলের তলায় সেটা কোনো মানুষ্যনামী সভ্য জীব দ্বারা চালিত হচ্ছে। কিছু সময়ের জন্য বনহুর হতবাক হয়ে পড়েছিলো।

হঠাৎ বনহুর চমকে উঠলো।

স্মিয়ং বলল—নামতে হবে এবার।

এতোক্ষণে বনহুর কথা বললো—বেশ চলো।

এসো। উঠে দাঁড়ালো স্মিয়ং।

আর্লিং স্মিথ তখন জলযানটা থামাতে ব্যস্ত।

জলযানটা থেমে পড়তেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো। এবার অন্য একটা শব্দ হচ্ছে, এরকম শব্দ বনহুর শুনেছিলো জলযানে প্রবেশ মুহূর্তে।

আর্লিং স্মিথ জলযানের গায়ে একটা সুইচে-চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো পাশের ঢাক্‌নাটা।

আর্লিং স্মিথ আর স্মিয়ং অদ্ভুত মুখোশ পরে নিয়েছে। বনহুরকেও তারা তার অক্সিজেন পাইপসহ ডুবুরী-আচ্ছাদন দ্বারা মাথাটা ঢেকে ফেলতে বললো।

বনহুর তার মুখোশে মুখসহ মাথাটা আবৃত করে নিলো। কোমরের বেল্টে সুতীক্ষ ধার ছোরা এবং অটোমেটিক পিস্তলটা ছিলো। বনহুর একবার ছোরা এবং অটোমেটিক ক্ষুদে পিস্তলটার উপরে হাত বুলিয়ে নিলো। না জানি ভাগ্যে কি আছে, তবে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে নিজকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করবে।

সঙ্গীদ্বয়সহ বনহুর নেমে পড়লো। চারদিকে থৈ থৈ জলরাশি। সমুদ্রতল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্য হলো সে, এখানেও বিরাট একটা ডুবন্ত পাহাড়। তবে এটা সে পূর্বের সে পাহাড় নয়, সেটা বেশ বুঝতে পারলো। তারা যেখানে নেমে দাঁড়ালো সেখানে একটা লম্বা সাবমেরিন ধরনের জলযান দেখতে পেলো। আর্লিং স্মিথ ও স্মিয়ং বনহুরকে নিয়ে সেই লম্বা জলযানটার মধ্যে প্রবেশ করলো।

এবার সাবমেরিন ধরনের জলযানটা সমুদ্রবক্ষে কোনো গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো বলে মনে হলো বনহুরের। কারণ সে সাবমেরিনের সম্মুখে কাঁচের মত সচ্ছ অংশ দিয়ে সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলো। সাবমেরিনই বটে, কারণ এই জলযানটার ভিতরে মাত্র দু'জন লোক কোনোরকমে বসতে পারে এবং এর ভিতরে যে-সব যন্ত্রপাতি নজরে পড়লো এসব অতি মারাত্মক ধরনের। বনহুর সব লক্ষ্য করছে নিপুণ দৃষ্টিতে।

যে পথে সাবমেরিনটা অগ্রসর হচ্ছিলো, সে পথের দু'ধারে সুউচ্চ পাথরস্তর পর্বত সমান উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর স্পষ্ট অনুভব করলো, কোনো পর্বতের বা পাহাড়ের গুহার সুড়ঙ্গপথে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সাবমেরিনটা থেমে পড়লো এবং এক মিনিট পর আবার চলতে আরম্ভ করলো। এবার কেমন যেন চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছে বনহুর। তবে কি শুকনো উচুনীচু পাথরের উপর দিয়ে সাবমেরিনটা চলেছে।

অল্পক্ষণ চলার পর থেমে পড়লো সাবমেরিন আকার জলযানটা। লোক দুটো সুইচ টিপতেই দরজা খুলে গেলো সাবমেরিনের। নেমে দাঁড়ালো তারা এবং বনহুরকে নামবার জন্য ইংগিত করলো।

বনহুর লোক দুটিকে অনুসরণ করলো। সে দেখলো, এখানে কোনো জলোচ্ছ্বাস বা জলরাশির উন্মত্ত ঢেউ নেই শুকনো মাটিও নয়—শুধু পাথরের ঢিবি। বনহুরকে নিয়ে লোক দু'জন এগুতে লাগলো। জায়গাটায় জলরাশি না থাকলেও আলো-বাতাস কিছু নেই। একটা বড় গর্তের মত সুড়ঙ্গমুখে এসে ওরা দু'জন দাঁড়ালো—অমনি নড়ে উঠলো পাথরখানা, তারপর দেখলো, পাথরখানা সরে যাচ্ছে একপাশে। ভিতরে নজর পড়তেই বনহুর উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখতে পেলো।

আর্লিং স্মিথ ও স্মিয়ং বনহুর সহ প্রবেশ করলো সেই সুড়ঙ্গ মধ্যে। বনহুর লক্ষ্য করলো সুন্দর বিরাট একটি গুহা—ঠিক শহুরে কোনো হলঘরের মত। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, গুহার মধ্যে নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র সাজানো রয়েছে। কক্ষমধ্যে কয়েকখানা চেয়ার, চেয়ারে উপবিষ্ট কয়েকজন লোক। বনহুর আরও বিস্মিত হলো, তাদের দেহে সাবমেরিন চালকদ্বয়ের মতই অদ্ভুত ড্রেস কিন্তু কারো মুখে কোনো মুখোশ বা আবরণ নেই। বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই তার সঙ্গীদ্বয় নিজ নিজ মুখের মুখোশ খুলে ফেললো, বনহুরকে খুলে ফেলার জন্য বললো তারা।

বনহুর নিজ মুখ থেকে ডুবুরী ড্রেসের মুখোশ খুলে ফেলতেই আশ্চর্য হলো। গভীর সাগরতলায় গুহার মধ্যে সচ্ছ আবহাওয়ায় এয়ার কন্ডিশনিং এবং অক্সিজেনের দ্বারা গুহার মধ্যে সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিশ্বাস নিতে কোনো অসুবিধা বা কষ্ট হচ্ছে না তার। এবার বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করলো, আরও অবাক হলো সে—গুহামধ্যে যারা উপবিষ্ট ছিল তাদের মধ্যে দু'জন নারীও রয়েছে। নারী দুটিও ইংরেজ মহিলা তা তাদের চেহারা দেখেই বেশ বুঝা যাচ্ছে।

বনহুরকে দেখেই গুহার মধ্যে সবাই বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়ে পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলো একজন—একে কোথায় পেলে আর্লিং স্মিথ?

আর্লিং স্মিথ জবাব দিলো—সাগরতলে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

স্মিয়ং বললো—কোনো গুপ্তচর হবে।

তরুণীদ্বয়ের একজন বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তাকালো সে বনহুরের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে। আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো, তারপর বললো—একে আটক করে রাখো, দেখো যেন না পালাতে পারে।

তরুণী যখন বনহুরের মুখে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছিলো তখন সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো তরুণীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে। এমন সুন্দরী তরুণী সে খুব কমই দেখেছে। তরুণীর দেহে যদিও তখন অদ্ভুত ড্রেস ছিলো তবু বনহুরের দৃষ্টিতে তার রূপলাবণ্য ধরা পড়ে গেলো অনায়াসে।

বনহুর কেমন যেন মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে ছিলো, চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না।

তরুণী বললো—নিয়ে যাও ওকে।

বনহুর একটু হেসে বললো—আমি গুপ্তচর নই সুন্দরী।

তরুণী কণ্ঠস্বর কঠিন করে বললো—বিশ্বাস কি তোমাকে?

আমার পোশাক, আমার প্রমাণ—আমি একজন ডুবুরী।

তরুণী গম্ভীর হয়ে উঠলো, তারপর দাঁতে দাঁতে পিষে বললো—এ পোশাক ছাড়া আমার রাজ্যে আসার সাধ্য কি তোমার।

রাজ্য!

হাঁ জানো না ঝাঁম সাগরের সমস্ত তলদেশ আমার রাজ্য। এখানকার রানী আমি। আর এদের দেখছো এরা সবাই আমার বিশ্বস্ত অনুচর। এবার দ্বিতীয় তরুণীর দিকে তাকালো প্রথম তরুণী —এ আমার সহচরী মিস্ এ্যালিন।

ধন্যবাদ। আস্তে করে উচ্চারণ করলো বনহুর। তারপর বললো—রাণী, তোমার নাম জানতে পারি কি?

যদিও তুমি আমার বন্দী কিন্তু তোমার সাহস দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি? তবু বলছি তোমাকে আমার নাম—মিস জীমস্ মীরা।

বনহুর একবার নয়, বার বার দুই উচ্চারণ করলো মিস জীমস্ মীরা। মিস জীমস্ মীরা---

ততক্ষণে আর্লিং ও স্মিয়ং বনহুরকে টেনে নিয়ে চললো।

বনহুরকে যখন পাশের এক গুহা বা সুড়ঙ্গমধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন তাকে পুনরায় মুখের আবরণ পরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

একটা লিফট্ এর মত চৌকানি বস্তুর উপরে দাঁড়ালো ওরা বনহুরকে নিয়ে। বনহুর এবং ওরা দু'জনসহ লিফটখানা এবার অল্প কিছুক্ষণ নেমে চললো তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো নিশ্চুপ হয়ে।

আর্লিং—বললো নেমে পড় বন্ধু।

বনহুর কিছু চিন্তা করছিলো, কাজেই সে আনমনা হয়ে পড়েছিলো একটু চমকে উঠে বললো—এ্যাঁ নামতে হবে আমাকে?

স্মিয়ং বললো—হাঁ, দেখছো না বন্দীশালা এসে গেছে।

বনহুর যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো, আর্লিং এবং স্মিয়ংকে লক্ষ্য করে বললো—তোমরা লিফ্‌ট থেকে নামবে না বন্ধুগণ?

আর্লিং বললো—না! তোমাকে শুধু পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবো।

বনহুর গুহাটার মধ্যে ভালভাবে তাকালো, আধো অন্ধকার লাগছে চারদিক। আর্লিং বললো—এখানেও তুমি সচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারবে। কাজেই মুখের অক্সিজেন পাইপ খুলে ফেলো। আর শোন, বন্দীশালা তোমার একার; এখানে আর কোনো বন্দী এখন নেই।

স্মিয়ং বললো—হাঁ, এটা তোমার ভাগ্য বলতে হবে।

বনহুর লিফট থেকে নেমে দাঁড়ালো।

হীমশীতল গুহার মধ্যস্থল এয়ার কন্ডিশনিং রয়েছে তাই কোনো অসুবিধা হলো না তার। বনহুর বললো—বন্ধু, আবার কখন আসবে তোমরা?

আর্লিং জবাব দিলো—মিস মীরার হুকুম হলেই আসবো আমরা।

বনহুর বললো—তোমরা যাচ্ছো যাও কিন্তু বড্ড ক্ষুধা বোধ করছি আমি কারণ—বহুক্ষণ হলো সাগরতলে এসেছি।

আর্লিং বললো আবার —মিস্ মীরাকে বলবো।

মিনতি ভরা স্বরে বললো বনহুর—দয়া করে বলো।

ওরা চলে গেলো।

বনহুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে তাকাচ্ছে, গভীর সাগরতলে এমন সুবন্দোবস্ত করা গুহা সত্যি আশ্চর্য বটে! দেয়ালে হাত দিয়েই স্পষ্ট দেখতে পেলো, সুইচ রয়েছে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো। হতবাক না হয়ে পারলো না বনহুর। ঠিক ফার্ষ্ট ক্লাশ ট্রেনের কামরার মত গুহার মধ্যভাগ। একপাশে গদি-আটা হেলনা চেয়ার, টেবিল আর সোফা। বনহুর নিজের দেহ থেকে ডুবুরী ড্রেস খুলে ফেললো। না কোনোরকম অসুবিধা বোধ করছে না তো,

নিশ্বাস নিতে কোনো কষ্টও হচ্ছে না। শরীরটা বেশ শান্ত ঠান্ডা মনে হচ্ছে। বহুক্ষণ ডুবুরী ড্রেস পরে থাকায় ক্লান্ত বোধ হচ্ছিলো, এখন নিজকে অনেকখানি হাল্কা লাগছে বনহুরের। চেয়ারের উপর ডুবুরী ড্রেসগুলো রেখে সোফার দিকে অগ্রসর হলো। এখন তার শরীরে কোনো জামা-কাপড় নেই শুধু পরনে একটি সিল্ক আন্ডারওয়্যার ছাড়া।

বনহুর সোফায় দেহটা এলিয়ে দিলো আবেশে। দেহ সুস্থ বোধ করলেও মন সুস্থ হলো না কারণ সে এসেছে কিউকিলা হত্যার জন্য আর হলো সে বন্দী। শাহীতে তার অনুচরগণ ভীষণ আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে। রহমান, ক্যাপটেন বোরহান ও আরও অনেকে। মহারাজ মোহন্ত সিন্ধু ও তাঁর কন্যা মালাও অত্যন্ত ঘাবড়ে পড়েছে তার জন্য। মালার কথা মনে হতেই বনহুরের মনটা মায়ায় আর্দ্র হয়ে উঠলো, বেচারীর কত আশা তাকে স্বামীরূপে পাবে। হাসিও পেলো বনহুরের মালার আচরণ মনে করে। নিজকে বিলিয়ে দেবার সেকি প্রচেষ্টা তার। বনহুর চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই মুহূর্তে মালাকে কাছে পেলে তবু হয়তো খানিকটা স্বস্তি পেতো সে। বড় একা নিঃসঙ্গ লাগছে এই নির্জন পাতালপুরীতে।

এইতো সবে শুরু—আরও কতদিন যে তাকে এভাবে কাটতে হবে কে জানে! একটা সিগারেটের জন্য মনটা উস্‌খুস্‌ করছে তার। সোফায় চীৎ হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো কতকথা—কিউকিলা হত্যা করাটাই হলো তার প্রথম কাজ। এই জলদৈত্যটাকে হত্যা না করা পর্যন্ত বনহুর নিশ্চিন্ত নয়। কত লোককে সে হত্যা করেছে—আরও করবে। সাক্ষাৎ শয়তান যেন কিউকিলা। যদিও বনহুর বন্দী হয়েছে তবু নিজকে সে সম্পূর্ণ বন্দী ভাবতে পারছে না। কারণ যারা তাকে আটক করে আনলো তারা এখন পর্যন্ত তার দেহ সার্চ করে দেখেনি বা তার পোশাক-পরিচ্ছদ পরীক্ষা করে ডিনামাইটগুলো বের করে নেয়নি।

বনহুর বিলম্ব না করে উঠে পড়লো, হঠাৎ যদি ওরা তার ডুবুরী ড্রেস সার্চ করে ডিনামাইটগুলো আবিষ্কার করে ফেলে তাহলেই প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবে। উঠে পড়লো বনহুর, ডুবুরী ড্রেসের ভেতর থেকে বের করে নিলো ডিনামাইটগুলো, আর অটোমেটিক পিস্তলটা। কোথায় লুকিয়ে রাখবে ভাবতে লাগলো, চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

হঠাৎ বনহুরের খেয়াল হলো, যে সোফাটায় সে এতোক্ষণ নিশ্চিন্তে বসেছিলো তার তলায় লুকিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। বনহুর দ্রুত হস্তে ডিনামাইটগুলো সোফার নিচে লুকিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো। পিছনে হাত

রেখে পায়চারী করলো কিছুক্ষণ। আবার বসলো, হাত দুটি দিয়ে চুলগুলো টানতে লাগলো আপন মনে। অধরদংশন করতে লাগলো।

চিরচঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল দস্যু বনহুর নিশ্চুপ বসে থাকবে, এটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অল্পক্ষণের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠলো—এখান থেকে না বের হলে কিউকিলাকে হত্যা করা সম্ভব হবে না। এভাবে চুপচাপ বসে থাকার সময়ই বা কোথায়। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। এতোক্ষণ তার জাহাজে ফিরে যাওয়ার কথা ছিলো কিন্তু সে যা ভেবেছিলো তা হলো কই! বনহুর দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করলো।

এমন সময় একটু শব্দ হলো; বনহুর চোখ মেলে চাইতেই দেখলো, তার সম্মুখে একটি লোক দাঁড়িয়ে—তার হাতে খাবারের ট্রে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে যমদূতের মত দু'জন লোক; তাদের হাতে জমকালো চক্চকে রিভলভার। বনহুর যমদূত দু'জনের হস্তস্থিত রিভলভার দু'টির দিকে একনজর তাকিয়ে দেখে নিয়ে দৃষ্টি স্থির করলো খাবারের ট্রের উপর। পাউরুটি, মাখন, চিনি, দুধ, চা—সব সাজানো আছে ট্রেটার উপর। বনহুর সম্মুখস্থ টেবিলে খাবারের ট্রে রাখতে বললো।

লোকটা খাবারের ট্রে টেবিলে রেখে চলে গেলো। তার সঙ্গেই বেরিয়ে গেলো যমদূতদ্বয়। বনহুর এবার নিশ্চিন্ত মনে খাবারের টেবিলে বসলো।

খাবার খেলো বনহুর তৃপ্তি সহকারে। বন্দীর প্রতি মিস মীরার অনুরাগ মন্দ নয় দেখে খুশি হলো সে মনে মনে। খাবারগুলো রুচিমতই হয়েছিলো।

খাওয়া শেষ করে বনহুর সোফায় দেহটা এলিয়ে দিলো। দেখা যাক্ এরপর তার ভাগ্যে কি অবস্থার সংযোগ হয়।

কতক্ষণ কেটে গেছে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো বনহুর, হঠাৎ একটা মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সোজা হয়ে বসলো। চোখ মেলে তাকিয়ে চমকে উঠলো, তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মিস এ্যালিন ও মিস মীরা। তাদের পিছনে উদ্যত রিভলভার হস্তে আর্লিং এবং স্মিয়ং।

বনহুর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে মিস মিরাকে অভিনন্দন জানালো। কিন্তু সে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলো কারণ তার দেহে একমাত্র সিল্ক আন্ডারওয়ার ছাড়া আর কিছু ছিলো না। বনহুর এগিয়ে গেলো তার ডুবুরী ড্রেসের দিকে, হাত বাড়াতেই মিস মীরা বললো—লজ্জার কোনো কারণ নেই যুবক। আমি এক্ষুণি তোমার জন্য ড্রেস আনতে বলছি।

বনহুর নিশ্চুপ সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মিস মীরা বললো—তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো, সঠিক জবাব দেবে?

বললো বনহুর—নিশ্চয়ই দেবো।

তোমার নাম কি বলো?

আমার নাম দেবরাজ।

দেবরাজ! এ আবার কেমন নাম?

মিস এ্যালিন বললো—দেবরাজ বুঝ না মীরা?

না! বললো মীরা।

বনহুর তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টি মেলে মিস মীরার দিকে। মীরার সৌন্দর্য তাকে যেন অভিভূত করে ফেলছে। সুন্দরী নারী সে বহু দেখেছে কিন্তু মীরা যেন অপূর্ব!

বললো মিস্ এ্যালিন—দেবরাজের মানে স্বর্গের রাজা।

বলো কি?

হাঁ মীরা, আমি শাস্ত্রের মাধ্যমে এ কথা পড়েছিলাম।

মিস্ মীরা অবাক হয়ে তাকালো বনহুরের নগ্ন দেহটার দিকে। নির্নিমেশ দৃষ্টি নিয়ে দেখছে সে ওকে।

বনহুর আরও বেশি বিব্রত বোধ করলো। সেও তাকালো মিস্ মীরার মুখের দিকে মীরার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো।

মিস্ মীরা বললো—বুঝলাম তুমি দেবরাজ কিন্তু আমার রাজ্যে কেন এসেছিলে বলো?

বনহুর সচ্ছকণ্ঠে জবাব দিলো—গভীর সমুদ্রতলে আপনার রাজ্য তা জানতাম না মিস মীরা।

কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এসেছো?

ভ্রমণ উদ্দেশ্যে।

এবার হেসে উঠলো মিস মীরা, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—মিথ্যা কথা! গভীর সাগরতলে কেউ কোনোদিন ভ্রমণ করতে আসেনা। জানো তোমাকে কিভাবে আমরা হত্যা করবো? মিথ্যা বলার শাস্তি কি টের পাবে এবার।

আমাকে আপনি হত্যা করবেন? কিন্তু আপন্যরা আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার দেখাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আমি আপনাদের অতিথি—আর আমি যে মিথ্যা বলছি তারই বা প্রমাণ কি?

আর্লিং বললো—তোমাকে যেভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি তাতে তুমি যে কোনো মতলব নিয়ে আসোনি তা তোমার হাবভাব দেখেই বুঝা গেছে।

বনহুর বললো—মতলব একটা ছিলো তা সবার সামনে বলা যাবে না। মিস মীরা, আপনি যদি একবার একা---

বেশ তাই আসবো, যদি এদের সম্মুখে বলতে তোমার আপত্তি থাকে। এখন তাহলে চলি, এসো এ্যালিন।

মিস মীরা ও এ্যালিন চলে গেলো, তাদের অনুসরণ করলো আর্লিং স্মিথ আর স্মিয়ং।

বনহুর হাসলো আপন মনে।

অল্পক্ষণ পর একটি লোক এক সেট ড্রেস নিয়ে হাজির হলো। বনহুর দেখলো যা সে কামনা করছিলো এ ড্রেসগুলো ঠিক সেই রকম। নাইট ড্রেসের মত দেখতে কতকটা। বনহুর ড্রেসটা পরে নিলো, নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো বেশ মানিয়েছে তাকে ড্রেসটা।

লোকটা চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছে, বনহুর বললো—আমাকে যদি একপ্যাকেট সিগারেট দিতে পারো তাহলে অনেক খুশি হতাম।

লোকটা খাঁটি সাহেব—লাল টকটকে চেহারা; বনহুরের কথায় হাসলো দাঁত বের করে, তারপর নিজের পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে দিলো আর একটা ম্যাচ বাক্স।

বনহুর বললো—ধন্যবাদ।

লোকটা চলে গেলো।

❑

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চললো। বনহুরের অনুচরদের মধ্যে ভীষণ একটা আতঙ্ক দেখা দিলো, আশঙ্কিত হয়ে পড়লো সবাই। চব্বিশ ঘন্টার জন্য ডুবুরী ড্রেসে অক্সিজেন পাইপে অক্সিজেন ভরা থাকে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার স্থলে বিয়াল্লিশ ঘন্টা অতিবাহিত হতে চললো।

রহমান ক্ষিপ্তের ন্যায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সমস্ত দিন স্পীড বোট নিয়ে সমুদ্রবক্ষ চষে ফিরেছে কিন্তু সর্দারের ফিরে আসার কোনো লক্ষণ সে পায়নি। ক্রমে হতাশ হয়ে পড়েছে রহমান— চোখে সে অন্ধকার দেখছে যেন।

বহু রাত ধরে সার্চলাইট নিয়ে রহমান অনুসন্ধান চালালো সর্দারের কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিমুখ হতে হলো তাকে। ফিরে এলো রহমান স্পীডবোট নিয়ে।

সমস্ত জাহাজে একটা অমঙ্গলের ছায়াপাত ঘটলো। এতোবড় সর্বনাশ হবে তা ভাবতে পারেনি বনহুরের অনুচরগণ।

মহারাজ মোহন্ত সিন্ধু এবং তার কন্যা মালা তো রোদন করতে লাগলো। দেবরাজকে তারা এভাবে হারাবে এ যেন কল্পনার বাইরে ছিলো তাদের। সবচেয়ে বেশি ভেঙ্গে পড়লো রহমান। সর্দারকে হারিয়ে কোনমুখে ফিরে যাবে সে কান্দাই আস্তানায়।

সেদিন সে রাত সবার অনিদ্রায়-অশান্তিতে কাটলো। একদিকে কিউকিলার জন্য সদা আতঙ্ক অন্যদিকে সর্দারের জন্য ভয়ানক দুশ্চিন্তা।

পরদিনও বুকভরা আশা নিয়ে রহমান ঝাঁম-সমুদ্রবক্ষে সর্দারের সন্ধান করে ফিরতে লাগলো। মহারাজ মোহন্ত সিন্ধুও দুদিন হলো ফিরে যাননি তাঁর ঝাঁম রাজ্যে। কন্যা মালাও রয়েছে তাঁর সঙ্গে।

ঝাঁম-সর্দার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছে—তাদের ঝাঁম-ঘাটিতে—না জানি কি হলো! দেবরাজ নিশ্চয়ই কিউকিলাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে, এই তাদের ধারণা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাহাজ 'শাহী' নিয়ে ফিরে এলো সবাই তৃতীয় রাতে ঝাঁম শহরে।

ঝাঁম সর্দার যখন জানতে পারলো, দেবরাজ সমুদ্রবক্ষ হতে ফিরে আসেনি তখন সে মাথায় হাত দিয়ে ভূতলে বসে পড়লো। রাজা মোহন্ত সিন্ধুর অবস্থাও তাই তিনিও একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। যে একটু ভরসা ছিলো তাও সমূলে বিনষ্ট হলো। কেমন করে তিনি দেশবাসীকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করবেন, ভেবে অস্থির হলেন।

মালা তো দেবরাজের জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলো। সে সর্বক্ষণ সমুদ্রতীরে গিয়ে উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকতো—যদি দেবরাজ ফিরে আসে! মৃত্যুভয় তাকে ঘরে আটকাতে পারলো না—কিউকিলার ভয়েও সে ভীত হলো না।

সখীগণ মালাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই মালা প্রকৃতিস্থ হচ্ছে না যেন। মালা দেবরাজকে এতো গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলো, সখীরা বুঝতে পেরে বিশ চিন্তিত হলো।

রহমান ওয়্যারলেসে নূরীকে ব্যাপারটা জানাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় নূরীর দিক থেকেই প্রশ্ন এলো—কেমন আছে বনহুর।

রহমান জবাব দিতে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো তার—কি জবাব দেবে সে! লাউড স্পীকারে মুখ রেখে থ হয়ে বসে রইলো বোবার মত। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা। অন্যান্য অনুচর ছিলো সেই স্থানে। বিস্মিত হলো তারা—রহমানের চোখে কোনোদিন পানি দেখেনি—আজ তার চোখে পানি!

বারবার নূরী প্রশ্ন করছে—বলো রহমান, আমার হুর কোথায়? কেমন আছে সে? জবাব দিচ্ছো না কেন?

তবু রহমান নীরব, পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে পড়েছে রহমান। নিজের অধর দংশন করছে সে।

নূরীর আবেগভরা কণ্ঠ—রহমান, আমার হুরকে কথা বলতে বলো। কতদিন তার কণ্ঠ শুনিনি। রহমান, ওকে কথা বলতে দাও।

রহমান অতিকষ্টে নিজকে সংযত করে নিয়ে বলে—নূরী, সর্দার এখন জাহাজে নেই।

কেন, কোথায় গেছে সে? তুমি না বলেছিলে, হুর সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করেছে? সে ফিরে এসেছে তো?

রহমান কোনো জবাব দিতে পারে না।

পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করে নূরী—নিশ্চুপ কেন বলো? কথা বলো রহমান? হুরের বাজুবন্দ কেন সে খুলে রেখেছে। কেন আমি তার কথা শুনতে পাই না?

কে জবাব দেবে—? রহমান লাউডস্পীকার মেশিন অফ করে দিয়েছে। হঠাৎ বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে, কোনোরকমে নিজেকে সামলে রাখতে পারে না সে।

নূরী রহমানের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বারবার ওয়্যারলেসের মেশিন চালু করে রহমানকে প্রশ্ন করে।

অগত্যা রহমান বলতে বাধ্য হলো—সর্দার সাগরতল থেকে ফিরে আসেনি!

আকাশ ভেঙ্গে পড়লো নূরীর মাথায়—কি সর্বনাশ হলো! তবে কি তার বনহুরকে সেই নররক্তখাদক দৈত্যরাজ হত্যা করে রক্ত শুষে নিয়েছে? মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লো নূরী। গড়াগড়ি দিয়ে রোদন করতে লাগলো

সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো যেন। বনহুরই যে তার জীবনের একমাত্র ভরসা। তার সব কিছু।

সমস্ত দিন নূরী কাঁদলো, তাকে কেউ ক্ষান্ত করতে পারলো না। কেঁদে কেঁদে এক সময় নূরী প্রকৃতিস্থ হলো বটে কিন্তু ঝাঁম রাজ্যে যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে নিলো।

এ সময় আস্তানার দায়িত্বভার ছিলো কায়েস আর মাহবুবের উপর। এরা সংবাদ শুনে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হলো। শুধু কায়েস আর মাহবুবই নয়, কান্দাই আস্তানায় বনহুরের প্রত্যেকটা অনুচর চিন্তিত এবং শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো।

কায়েস সর্দারের সঠিক খবর জানার জন্য ঝাঁম রাজ্যে যেতে মনস্থির করে নিলো। নূরীও যাবে তার সঙ্গে, এরকম কথাবার্তা হলো।

নূরীর প্রিয় সাথী ছিলো নাসরিন। বনহুর ঝাঁম রাজ্যে কিউকিলা হত্যা করার জন্য গমন করলে নূরী যখন সদা বিষণ্ন মুখে বসে বসে ভাবতো তখন হাসিগানে নাসরিন তাকে মুখর করে তোলার চেষ্টা করতো। কখনও ঝাঁম জঙ্গলে যেতো দু'জন ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে, কখনও ছোট্ট নৌকা নিয়ে ঝরণার জলে ঘুরে বেড়াতো দাঁড় টেনে টেনে। নাসরিন আর নূরী একসঙ্গে গান গাইতো, একসঙ্গে বেড়াতো ঘুমাতোও একসঙ্গে। কারণ রহমানও নেই, বনহুরও নেই—নূরী আর নাসরিন উভয়েই সঙ্গীহারা। দু'জন মুখোমুখি শুয়ে গল্প করতো দু'জনার প্রিয়তমের।

আজ নূরীর মুখের হাসি বিলীন হয়ে গেছে, সর্বক্ষণ তার চোখে পানি লেগেই রয়েছে। গন্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে সদা অশ্রু ধারা। নাসরিন তাকে কিছুতেই যেন প্রবোধ দিতে পারছিলো না। অনেক করে বুঝানোর পরও সে শান্ত হলো না একটুও।

কায়েস এবং মাহবুব নূরীকে নিয়ে মহাবিপদে পড়লো জটিল এক সমস্যায় পড়লো তারা। এদিকে আস্তানা ছেড়ে কায়েস আর মাহবুবের একসঙ্গে যাওয়াও চলবে না। রহমান নেই, সে থাকলে তবু হতো।

কায়েস ওয়্যারলেসে সংবাদ পাঠালো রহমানের কাছে, নূরী সম্বন্ধে সব বললো সে তাকে। নূরী ঝাঁম রাজ্যে যাওয়ার জন্য একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে—তাকে না নিয়ে গেলেই নয়।

রহমান সংবাদ শুনে বেশি ঘাবড়ে গেলো, কারণ নূরী এসে সর্দারকে না দেখে আরও উন্মত্ত হয়ে উঠবে। তাকে সংযত রাখাই মুস্কিল হয়ে পড়বে তখন।

রহমানের কোনো আপত্তিই শুনতে রাজি নয় নূরী—জানালো কায়েস। অগত্যা রহমান নূরীকে ঝাঁম রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলো।

বনহুরকে নিয়ে ঝাঁম রাজ্যে যখন তোলপাড় শুরু হয়েছে তখন কান্দাই আস্তানায় নূরী পাগলিনীপ্রায় হয়ে উঠেছে। তার বনহুরকে হারিয়ে সে কিছুতেই বাঁচতে রাজি নয়। আস্তানার সবাই তাকে সান্ত্বনা দিয়েও শান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না, এমনকি দাইমাও বুঝিয়ে শুঝিয়ে দেখলো তবু নূরী অবুঝের মত সদা রোদন করে চলেছে।

কায়েস একদিন মনিরার কাছে গেলো, বিশেষ করে মনিরা আর বাচ্চা নূর কেমন আছে জানবার জন্য। কান্দাই পৌঁছলে নিশ্চয়ই রহমান তাকে প্রশ্ন করতে পারে, বৌরাণী আর ছোট সাহেব কেমন আছে। কায়েস তাই কান্দাই শহরে একদিন গিয়ে হাজির হলো।

মনিরা আনন্দিত হয়ে এসে দাঁড়ালো কায়েসের সামনে। সে মনে করলো না জানি তার স্বামীর কোনোসংবাদ এনেছে কায়েস। নিশ্চয়ই সে ভাল আছে। কিন্তু মনিরা যখন কায়েসের গম্ভীর বিষণ্ন মুখ লক্ষ্য করলো তখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলো যেন। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো মনিরা—কায়েস, কি সংবাদ বলো? অমন চুপ হয়ে আছো কেন?

কায়েস অনেক কষ্টে নিজকে সংযত রেখে বললো—সংবাদ ভাল নয় বৌরাণী।

শিউরে উঠলো, মনিরা, আশঙ্কিতভাবে বললো—তোমাদের সর্দার ভাল আছে তো?

কোনো জবাব না দিয়ে মুখ ফেরালো কায়েস।

মনিরার বুকের মধ্যে তখন ঝড় উঠেছে না জানি কি দুঃসংবাদ তাকে শুনতে হবে। চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠলো মুহূর্তে। কানটা গরম হয়ে উঠেছে গনগনে সীসার মত।

ঠিক সেই দন্ডে নূর মায়ের পিছনে একটা থামের আড়ালে এসে দাঁড়ায়। কায়েসকে সে আরও কয়েকবার এ বাড়িতে আসতে দেখেছে। তাকে দেখলেই সে কোলে তুলে নিয়ে আদর করেছে, ঠিক রহমান চাচার মত। কিন্তু আজকের মত এমন চুপি চুপি আসেনি তো সে কোনো দিন। নিশ্চয়ই তার মাকে কোনো গোপন কথা বলতে এসেছে লোকটা। কি বলে শুনবার জন্য নূর কান পেতে চুপ করে দাঁড়ালো।

মনিরা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো—বলো, বলো কয়েস সে কেমন আছে? কেমন আছে বলো?

সর্দারের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না বৌরাণী।

কেন? কোথায় গিয়েছিলো সে?

ঝাঁম দেশের নাম শুনেছেন কিনা জানি না, সর্দার সেই দেশে গিয়েছিলেন কিন্তু আর ফিরে আসেননি।

কায়েস গোপন করে গেলো আসল কথাটা। সর্দার ঝাঁম দেশ থেকে ফিরে আসেননি, এটাই শুধু বললো। সাগরবক্ষে গভীর জলের তলায় সে গিয়েছিলো কিউকিলা হত্যার জন্য সে কথা সম্পূর্ণ চেপে গেলো ভয়ে। বৌরাণী যদি আরও কেঁদে কেটে হুলস্থুল বাঁধিয়ে বসে! তার চেয়ে যা বলেছে তাই যথেষ্ট।

কায়েস চলে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি মনিরার মনে সন্দেহ জাগলো, ডাকলো সে—শোন কায়েস যেও না।

থমকে দাঁড়লো কায়েস, পালাতে পারলে সে যেন বেঁচে যেতো কোনোরকমে। হাতের মধ্যে হাত কচলাতে লাগলো সে ধীরে ধীরে।

মনিরা সরে এলো, গভীর ধরা গলায় বললো—সঠিক জবাব দাও কায়েস কি হয়েছে তোমাদের সর্দারের?

বৌরাণী যা বললাম তাই---

না, তুমি কিছু লুকোচ্ছো আমার কাছে। বলো, বলো কায়েস, সত্যি করে বলো? আমার কাছে কিচ্ছু লুকোবে না।

বৌরাণী।

বলো কায়েস সত্যি কি সে ঝাঁম দেশে গিয়েছিলো আর সেখানে থেকে ফিরে আসেনি? আমার মনে হচ্ছে, তুমি কিছু কঠিন কথা গোপন করছো?

না না বৌরাণী আমি সত্যি কথা বলতে পারবো না। আমাকে মাফ করবেন আপনি। পা বাড়ায় সে চলে যাবার জন্য।

এমন সময় আড়াল থেকে ছুটে এসে কায়েসের পথ রোধ করে দাঁড়ায় নূর দৃঢ় গলায় বলে—তোমাকে যেতে দেবো না কায়েস চাচা যতক্ষণ তুমি আম্মির কাছে সব কথা সত্যি করে না বলেছো।

হঠাৎ নূরের এভাবে আবির্ভাব হতে দেখে মনিরা আর কায়েস হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। মনিরা ও কায়েস মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নেয়।

নূর কায়েসকে জড়িয়ে ধরে—বলো, আম্মি যা জিজ্ঞাসা করছিলো বলো?

মনিরা নূরকে টেনে নেয় কোলের কাছে।

কায়েস সেই ফাঁকে ছুটে পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

নূর বলে উঠে—আম্মি, কায়েস চাচা কার কথা বলছিলো কে তাদের সর্দার যে ঝাঁম দেশ থেকে ফিরে আসেনি? কে সে সর্দার?

না না, ও কিছু নয়; কিছু নয় বাবা।

আম্মি, তুমি সর্দারের কথাটাই বার বার কায়েস চাচাকে জিজ্ঞাসা করছিলে বলো কে সে?

সর্দার! সর্দার! তোমার কায়েস চাচাদের সর্দার।

তারজন্য তোমার এতো চিন্তা কেন আম্মি?

তোমার আব্বার বন্ধু কিনা তাই---

আব্বার বন্ধু?

হাঁ বাবা, তোমার আব্বার বন্ধু।

খুব ভাল মানুষ বুঝি কায়েস চাচাদের সর্দার?

খুব ভাল--গলা ধরে আসে মনিরার। সে নূরকে বুকে চেপে ধরে গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

❑

সমুদ্রতলে কয়েকদিন কেটে গেছে বনহুরের।

এখানে যদিও সে বন্দী তবু মিস জীমস্ মীরার অনুচরগণ তার প্রতি কোনো অসৎ ব্যবহার করেনি, তবে সর্বক্ষণ কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে তারা তার উপরে যেন সে পালাতে না পারে।

বনহুর এ কদিন অনেক সন্ধান লাভ করেছে; কতকটা সে ইচ্ছে করেই পালাবার চেষ্টা করেনি। গভীর সাগরতলায় এমন একটা যে দল বা আস্তানা আছে সত্যি বিস্ময়কর। বনহুর জানতে চায় সাগরতলের এই গভীর রহস্য। কে এরা? কিই বা এদের উদ্দেশ্য? মিস জীমস্ মীরা কে? আর গভীর সাগরতলায় তার রাজ্যই বা কেমন?

বনহুর চেষ্টা করছে এদের দলভুক্ত হতে এবং ভিতরের সব রহস্য উদঘাটন করতে।

এই কয়দিনের মধ্যে জিম মীরা একদিন শুধু এসেছিলো তার গুহায়, তবু তার সঙ্গে ছিলো দু'জন রিভলভারধারী দক্ষ পাহারদার। বনহুর সুযোগ খুঁজছিলো মিস মীরাকে আয়ত্তে আনবার। মীরাকে কৌশলে বশীভূত করতে পারলে সে সব জানতে পারবে। এমনও হতে পারে, তখন দৈত্যরাজ কিউকিলাকে হত্যা করাও সহজ হবে।

কিন্তু বনহুর মিস জীমস্ মীরাকে তেমন করে নাগালের মধ্যে পায়নি এখনও। ওকে নিতান্তভাবে প্রয়োজন তার।

বনহুরকে যে গুহায় আটক করে রাখা হয়েছিলো সে গুহার দ্বিতীয় কোনো পথ ছিলো না। শুধু পাশের ছোট্ট একটা গুহা বাথরুম হিসাবে ব্যবহার করার জন্য নির্ধারিত ছিলো। এই গুহার মধ্যে ছিলো একটি ছোট্ট ছিদ্রপথ, এই ছিদ্রপথে সমুদ্রগর্ভের বহুদূর অবধি দৃষ্টিগোচর হতো। ছিদ্রপথের আবরণ ছিলো সচ্ছ পাথরের তৈরি তাই সব দেখা যেতো স্পষ্টভাবে।

বনহুর এই ছিদ্রপথে সাগরতলে সবকিছু লক্ষ্য করতো। অনেক বিস্ময়কর জিনিস তার দৃষ্টিগোচর হতো যা সে কল্পনা করেনি কোনোদিন। আর ভাবতো কিউকিলা হত্যার কথা।

সেদিন বনহুর গুহার মধ্যে একটা গদি-আঁটা সোফায় বসে গভীরভাবে চিন্তা করছিলো মনটা বড় অস্থির লাগছে এমনিভাবে আর কতদিন এটি নির্জনগুহায় কাটাবে। তার চঞ্চল মন আর বন্দী থাকতে চাইছিলো না। কখনও পায়চারী করছিলো কখনও বা আসন গ্রহণ করছিলো কখনও বা ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাচ্ছিলো অসীম জলরাশির দিকে। কতরকম মাছ, হাঙ্গর, কুমীর, কচ্ছপ—কতরকম জলজীব সাঁতার কেটে কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আনমনা হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুর, বিস্ময়ভরা নয়নে দেখে সে প্রকৃতির এই অদ্ভুত সৃষ্টি।

এমন সময় গুহামধ্যে কেউ যেন প্রবেশ করলো টের পেয়ে এগিয়ে আসে বনহুর, অবাক হয়—মিস জীমস্ মীরা দাড়িয়ে আছে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো জীমস্ মীরার সম্মুখে পা থেকে মাথা অবধি তাকিয়ে দেখে নিলো একবার।

বললো জীমস্ মীরা—কি দেখছো?

স্পষ্ট করে জবাব দিলো বনহুর—তোমাকে।

জীমস্ মীরার চোখেমুখে ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠলো, রাগত কণ্ঠে বললো—তোমার স্পর্ধা দেখে আমি স্তম্ভিত হচ্ছি—ভুলে গেছো তুমি আমার বন্দী?

মৃদু হেসে বললো বনহুর—উহুঁ ভুলিনি সে কথা।

তবে আমাকে এভাবে অপমান করলে কেন?

কে বললো তোমাকে আমি অপমান করলাম? মিস জিমস্ মীরা আমি তোমাকে ভালবাসি—বনহুর ওর হাত ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে মিস মীরা ঠাঁই করে বনহুরের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলো বনহুর হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে।

মিস মীরা অবাক হয়ে তাকালো—তার চড় খেয়ে হাসছে লোকটা পাগল নাকি।

বনহুর ওর মুখের কাছে ঝুঁকে বললো—তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো না মীরা?

রাগে তখন গসগস করছে মিস জিমস্ মীরা। ওর নিশ্বাস দ্রুত বইছে চোখ দুটি দিয়ে আগুন ছিটকে বের হচ্ছে যেন। বনহুরকে হাসতে দেখে রাগটা আরও বেড়ে গেছে মিস মীরার।

বনহুর বললো—মিছামিছি রাগ করছো মিস মীরা। শান্ত হও। মনোযোগ সহকারে শোন আমার কথাগুলো।

রুক্ষ কণ্ঠে বললো মিস মীরা—আমি তোমার কোনো কথাই শুনবো না।

তাহলে কেন এসেছিলে তুমি?

অনুগ্রহ করে তোমার খোঁজ নিতে।

ধন্যবাদ। তবে অনুগ্রহ করে আমার কয়েকটা কথা যদি শুনতে মীরা।

তুমি আমাকে ভালবাসো—এই কথা জানতে চাও—এই তো?

হাঁ মীরা, আমি তোমাকে---

আমি রাণী তা জানো?

জানি।

তুমি আমার বন্দী একথা নিশ্চয়ই স্বীকার কারো?

করি। কিন্তু তবু তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে। মীরা! মীরা আমাকে বিমুখ করো না।

বনহুর কৌশলে মীরাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে। ওকে বশীভূত করতে না পারলে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিউকিলা হত্যা ছাড়াও সাগরতলের রহস্য তাকে উদঘাটন করতে হবে। তাই সে মিস জীমস মীরাকে নিজের পাশে ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চায়। সে জানে, নারীমন যতই কঠিন থাক তাকে নুয়ে আনতে বেশি বেগ পেতে হয় না, বিশেষ করে অবিবাহিতা তরুণী মিস জীমস্ মীরাকে।

বনহুরের কথায় মিস জীমস্ মীরা অধর দংশন করতে লাগলো। মুখোভাব অনেকটা কোমল হয়ে আসছে।

বনহুর বুঝতে পারলো ঔষধ ধরেছে, বললো—বসো মীরা।

রুক্ষ কণ্ঠেই বললো মীরা—যা বলবার থাকে বলো? আমি বন্দীর ঘরে বসতে রাজি নই।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো, বললো—আমি তোমার শত্রু নই মিস মীরা।

আমি প্রথম দিন বলেছি, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি, এ কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো? তুমি আমার কাছে কি চাও, আমি তোমাকে তাই দেবো।

মিস জীমস্ মীরার ভ্রু দুটি কুঁচকে উঠলো, নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুরের নীল সুন্দর দুটি চোখের দিকে। ধীরে ধীরে সচ্ছ হয়ে এলো মিস মীরার মুখোভাব। মীরা অপলক নয়নে তাকিয়ে আছে, তার চোখের সম্মুখে ভাসছে প্রথম দিনে বনহুরের নগ্ন সুন্দর বলিষ্ঠ দীপ্ত দেহখানা। আস্তে আস্তে জীমস্ মীরা সরে আসছে বনহুরের দিকে, হাত দুখানা প্রসারিত হয়ে আসছে তার।

বনহুরও এগুচ্ছে ওর দিকে, জীমস্ মীরার দৃষ্টির সঙ্গে স্থির হয়ে আছে বনহুরের দৃষ্টি। সেও এগুচ্ছে নিজের অলক্ষ্যে, বিস্মৃতির পথে তালিয়ে যাচ্ছে যেন সে ক্রমান্বয়ে।

অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলো বনহুর—জীমস্ মীরা, তোমাকে আমি ভালবাসি, যা চাও তাই দেবো আমি তোমাকে! তাই দেবো আমি তোমাকে.......জীমস্ মীরাকে বনহুর জড়িয়ে ধরলো গভীর আবেগে। মুখটা নেমে এলো ওর মুখের উপর নিবিড়ভাবে।

মিস মীরাও বনহুরের কণ্ঠে আলিঙ্গন করে ধরলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বনহুরের গালে প্রচন্ড একটা চড় বসিয়ে দিলো তারপর নিজকে ওর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে গেলো দ্রুতগতিতে।

বনহুর বাম হাতের তালু দিয়ে নিজের গলাটা একবার নেড়ে নিলো, তারপর হেসে উঠলো আপন মনে।

জীমস্ মীরা চলে গেলো বটে কিন্তু তার সমস্ত দেহ-মন এক বিপুল উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। নিজের গুহায় ফিরেও সে প্রকৃতিস্থ হতে পারছিলো না, বন্দী যুবকের নিবিড়তম আকর্ষণ তাকে যেন অভিভূত করে ফেলছিলো। কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো সে।

আর কেউ মিস জীমস্ মীরার এই মনোভাব লক্ষ্য না করলেও মিস এ্যালিন করলো, তার কাছে ধরা পড়ে গেলো সে। তবে কেন মিস জীমস্ মীরা এমন আনমনা হয়ে পড়েছে, এটা সে সঠিক বুঝতে পারলো না।

একসময় ওকে জিজ্ঞাসা করেও কোনো উত্তর পেলো না মিস এ্যালিন।

মিস জীমস্ মীরা সাগরতল রাজ্যের রাণী হলেও এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ছিলো—সেই হলো সর্বেসর্বা। তার কথামতই রাণীকে উঠতে-বসতে ও কাজ করতে হলো। সে-ই জীমস্ মীরাকে রাণী করে হাতের মুঠোয় রেখেছিলো। রাণী হয়েও সে বৈজ্ঞানিকটিকে ভয় করতো ভীষণভাবে। যদিও বৈজ্ঞানিক জ্যামস্ কোথায় থাকতো জানতো না মিস মীরা, মিস এ্যালিন বা তাদের দলের কোনো লোক তবু তারা সবাই আতঙ্কিতভাবে সময় কাটাতো জ্যামসের জন্য।

মিস এ্যালিন মিস মীরার ভাব লক্ষ্য করে ভ্রুকুটি করে বললো—ব্যাপার কি জীমস্, হঠাৎ আজ যে বড় আনন্দমুখর লাগছে তোমাকে?

মিস জীমস্ মাথা নত করলো, একটু হেসে বললো—সাগরতলের রাণী আমি, আমার কত আনন্দ জানো না?

সব জানি। জ্যামস্ বাবা বলেছিলেন, তোমাকে না পেলে তাঁর সব সাধনা নষ্ট হয়ে যেতো,তুমি নাকি খুব লাকী মেয়ে।

হাঁ, বাবা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কিন্তু এ্যালিন, জানি না বাবাকে কেন যেন আমার বড্ড ভয় করে।

তুমি নিজের বাবাকে ভয় করো মীরা?

না না ভয় করি না, কিন্তু....থেমে যায় মিস মীরা।

সেদিন আর কোনো কথা চলে না এ্যালিন আর মিস মীরার মধ্যে। কারণ আর্লিং আর স্মিয়ং এসে পড়ে সেখানে।

❑

রাত কি দিন এখানে বুঝবার জো নেই। বনহুরের যখন ঘুম পায় ঘুমায় আর যখন ঘুম না পায় তখন জেগে থাকে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। আজ প্রায় সপ্তাহ হলো সে এদের হাতে বন্দী হয়েছে। এর মধ্যে বনহুর জানতে পেরেছে অনেক কিছু। আরও জানার বাসনা আছে তার! সেদিন ঘুম থেকে উঠে বনহুর তার ডুবুরী ড্রেস পরীক্ষা করে দেখছিলো, এবার ছুটবে সে অজানার উদ্দেশ্যে।

ঐ সময়ে পিছনে লঘু পদশব্দ শুনতে পেয়ে দাঁড়ালো বনহুর, দেখলো ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে মিস জীমস্ মীরা। চোখেমুখে একটা ব্যাকুল চাহনি!

বনহুর বললো—মিস মীরা তুমি!

মিস মীরা নির্বাক, কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলো শুধু।

বনহুর দেখলো, আজ জীমস্ মীরার দেহে হাল্কা নাইট ড্রেস। চুলগুলো এলোমেলো, বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে কাঁধের চারপাশে। চোখ দুটিতে তন্দ্রা-ঢুলুঢুলু ভাব। বনহুর বুঝতে পারলো, এখন নিশ্চয়ই রাত, শয্যা ত্যাগ করে উঠে এসেছে বোধ হয় মিস জীমস্ মীরা। পাতলা নীলাভো গাউনের মধ্য দিয়ে জীমস্ মীরার যৌবনদীপ্ত ফিকে গোলাপী দেহটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না, মোহগ্রস্তের মত সরে আসে জীমস্ মীরার দিকে। ডান হাতখানা রাখে বনহুর জীমস্ মীরার কাঁধে।

সেই মুহূর্তে ওদিকে আড়ালে লুকিয়ে পড়ে একটা ছায়ামূর্তি। ঠিক বনহুর আর জীমস্ মীরার নিকট হতে কয়েক হাত দূরে। সব লক্ষ্য করছে ছায়ামূর্তি আড়াল থেকে।

বনহুর ভুলে যায় নিজের অস্তিত্ব, গভীর আবেগে টেনে নেয় জীমস্ মীরাকে নিবিড়ভাবে। বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুর চাপে নিষ্পেষিত হয় ওর শুভ্র কোমল দেহটা। ওষ্ঠদ্বয় রাঙা হয়ে উঠে মুহূর্তে।

কিন্তু একি করছে! বনহুর নিজকে সংযত করে নেয় এবং মুক্ত করে দেয় জীমস্ মীরাকে! জীমস্ মীরা আর একদন্ড বিলম্ব না করে দ্রুত পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে জীমস্ মীরা। ভীত নজরে চারদিকে তাকাচ্ছে সে, কেউতো দেখে ফেলেনি বন্দীর গুহায় গিয়েছিলো এতো রাতে! ভয় কাউকে

করে না জীমস্ মীরার ভয় শুধু জ্যামস্ বাবাকে। সে জানে, বৈজ্ঞানিক জ্যামস্ অতি ভয়ঙ্কর আর ভীষণ নিষ্ঠুর। কোনোক্রমে সে যদি জানতে পারে, বন্দীর গুহায় গিয়েছিলো তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

জীমস্ মীরা শয্যা গ্রহণ করলো, চাদরখানা টেনে দিলো নিজের শরীরে।

একটু পরে আড়াল থেকে বেরিয়ে মিস এ্যালিন তার নিজের শয্যায় শয়ন করলো।

মিস জীমস্ মীরা গুহা ত্যাগ করে চলে আসার পর বনহুর লক্ষ্য করেছিলো, আরও কেউ যেন তার গুহা থেকে বেরিয়ে গেলো অতি গোপনে।

বনহুর কিছুক্ষণ পায়চারী করতে করতে চিন্তা করে নিলো, কেউ কি তাহলে জীমস্ মীরাকে অনুসরণ করেছিলো? ওকে ফলো করে প্রবেশ করেছিলো তার গুহায়? গুহাটা ক্ষুদ্র নয়—বিরাট বড়। ট্রেনের কামরার মত লম্বা এবং আঁকাবাঁকা এবড়ো-থেবড়ো—এক নজরে সব দিকে নজর যায় না।

বনহুর তার ডুবুরী ড্রেস পরে নিলো দ্রুতহস্তে, তারপর অক্সিজেন পাইপসহ মুখোশটা পরে বেরিয়ে পড়লো! সে এক'দিন বের হবার পথ এবং কৌশল শিখে নিয়েছিলো। সন্তর্পণে বাইরে এসে দাঁড়ালো, দরজা খুলতেই ভেবেছিলো সাগরের জলরাশি তাকে অভিনন্দন জানাবে কিন্তু কোথায় জল? সুন্দর সুড়ঙ্গপথ চলে গেছে সম্মুখ দিকে। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে এগুতে লাগলো বনহুর। কিছুদূর অগ্রসর হতেই সম্মুখে একটি গুহামুখ দেখে ভিতরে প্রবেশ করলো। আলগোছে এগুতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, পিছু হটে একটা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করলো বনহুর। দেখলো গুহার মধ্যে শয্যায় শায়িত এক যুবতী, বনহুরের চিনতে বাকি রইলো না—মিস জীমস্ মীরা নিদ্রায় মগ্ন রয়েছে।

হঠাৎ খুট করে শব্দ হলো, বনহুরের দৃষ্টি পড়লো—আধা অন্ধকারে জীমস্ মীরার শয্যার দিকে এগিয়ে আসছে একটি ছায়ামূর্তি। শিউরে উঠলো বনহুর, ছায়ামূর্তির হস্তে সুতীক্ষ্ণ ধার একখানা ছোরা। ছোরাখানা সে ঘুমন্ত জীমস্ মীরার বুকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য যেমন উদ্যত হলো, অমনি বনহুর পিছন থেকে খপ করে ধরে ফেললো! সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা কেড়ে নিলো ছায়ামূর্তির মুঠোর মধ্য থেকে।

গুহার স্বল্প আলোতে চমকে উঠলো বনহুর, দেখলো ছায়ামূর্তি মিস এ্যালিন।

বনহুরের দেহে তখন ডুবুরীর ড্রেস ছিলো, মুখে ছিলো অক্সিজেন পাইপসহ মুখোশ, তাই বনহুরকে মিস এ্যালিন চিনতে পারলো না।

ওদিকে মিস জীমস্ মীরা নিদ্রায় অচেতন।

মিস এ্যালিন ভয়ে পালিয়ে গেলো দ্রুত সেখান হতে।

বনহুর মিস জীমস্ মীরার গুহার মধ্যে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। মিস এ্যালিন যে পথে বেরিয়ে গেছে এ পথে বেরিয়ে যাবে কিনা ভাবছে এমন সময় বনহুরকে পিছন থেকে দু'জন লোক আক্রমণ করে বসলো।

আচমকা আক্রমণে বনহুর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলো, ফিরে দাঁড়িয়েই দেখলো, আর্লিং ও স্মিয়ং উদ্যত ছোরা বাগিয়ে ধরেছে। দু'জনের হাতে দু'খানা সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

বনহুরকে লক্ষ্য করে আর্লিং আর স্মিয়ং ছোরা বাগিয়ে দিতে গেলো। বনহুর দু'হাতে দু'জনার দু'খানা হাত ধরে ফেললো খপ করে, সঙ্গে সঙ্গে মোচড় দিলো ভীষণভাবে।

বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে আর্লিং আর স্মিয়ং-এর হাত মুচড়ে গেলো যেন, দু'জনই কুঁড়ে বসে পড়লো ভূতলে।

ততক্ষণে জেগে উঠেছে জীমস্ মীরা, স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেছে সে একেবারে। বিস্ময়ভরা নয়নে দেখছে সে স্তব্ধ হয়ে।

বনহুর আর্লিং আর স্মিয়ং-এর হাত থেকে ছোরা দু'খানা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তারপর বুট দিয়ে সজোরে মারলো এক লাথি আর্লিং-এর চোয়ালে।

আর্লিং ছিটকে গিয়ে পড়লো কয়েক হাত দূরে।

পিছন থেকে স্মিয়ং বনহুরকে জাপটে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ওকে খেলনা পুতুলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলো। গুহার মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়লো স্মিয়ং।

আর পুনঃ আক্রমণ করলো না ওরা, দু'জন উঠি-পড়ি করে পালিয়ে গেলো সেখান থেকে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, মিস জীমস্ মীরা হতবাক হয়ে গেছে। হাসি পেলো বনহুরের, এই কি হলো সমুদ্র তলদেশের রাণী? নিজের মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললো বনহুর।

মিস মীরার মুখ দীপ্ত হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি ছুটে এলো বনহুরের পাশে—একি তুমি!

হাঁ, আমি মীরা। জানো, মিস এ্যালিন তোমাকে এতোক্ষণে হত্যা করে ফেলতো।

মিস এ্যালিন!

হাঁ, তোমার সহচরী বা সঙ্গিনী।

আমাকে সে হত্যা করতে গিয়েছিলো, বলো কি?

এতোক্ষণে তোমার বুকের রক্তে সিক্ত হয়ে উঠতো এই পাতাল-পুরীর শুভ্র বিছানাটা। এই বুঝি তোমার রাজ্যের নিয়ম আর শৃঙ্খলা? তুমি এদের রাণী আর তোমাকে এরা হত্যা করার জন্য উন্মুখ!

মিস জীমস্ মীরা অসহায় চোখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। অতি করুণ ব্যথাভরা সে চাহনি। বললো সে—তুমি জানো না, এখানে আমি কত অসহায়।

তোমাকে দেখে আজ সেইরকম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তুমি এখানে মোটেই নিরাপদ নও!

হাঁ, তোমার ধারণা সম্পূর্ণ সত্য। তোমাকে একদিন সব বলবো, কিন্তু আজ নয়—তুমি যাও, শীঘ্র যাও আমার গুহা থেকে।

যদি না যাই?

ঐ যে আর্লিং আর স্মিয়ং পালিয়ে গেলো—ওরা জ্যামস্ বাবার কাছে গিয়ে সংবাদ দেবে। সে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক! যদিও আমাকে কন্যা বলে স্বীকার করে কিন্তু ক্ষমা সে করবে না। তোমাকে এবং আমাকে হত্যা করবে।

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মিস মীরা, তোমার জ্যামস বাবা আমার কিছু করতে পারবে না।

তুমি জানো না বন্দী, সে কতবড় বৈজ্ঞানিক, কিউকিলার মত একটা রাক্ষসকে সে পুতুলের মত নাচায়!

বনহুর অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—কিউকিলা!

হাঁ, দৈত্য—জলদৈত্য সে! অতি ভয়ঙ্কর এক নর রক্তপিপাসু রাক্ষস।

কিউকিলা......কিউকিলা......ঐ জলদানবটা বৈজ্ঞানিক জ্যামস্ বাবার পোষা পুতুল? বলো কি মিস মীরা? বনহুরের মুখমন্ডল উজ্জ্বল দীপ্তময় হয়ে উঠলো।

বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ময়ভরা নয়নে মিস জীমস্ মীরা। সে ভেবে পাচ্ছে না, বন্দী কেন এতো দীপ্তময় হয়ে উঠলো। এতোবড় ভয়ঙ্কর কথাটা শুনে সে ঘাবড়ে গেলো না কেন!

বনহুর মিস মীরার হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরলো—জ্যামস্ বাবা কোথায়? তার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারো?

মিস মীরা বিবর্ণ হয়ে উঠলো, ভয়কম্পিত কণ্ঠে বললো—এ তুমি কি বলছো বন্দী? তুমি যাবে জ্যামস্ বাবার কাছে।

হাঁ মীরা।

মরবে। সেখানে গেলে মরতে হবে আমাকে এবং তোমাকে।

তুমি না সমুদ্রতলের রাণী?

সে মাত্র ছলনা। আমাকে রাণী বানিয়ে আমার বাবা সবকিছু অধিকার করে নিয়েছে। ঐ জ্যামস্ বাবা......সে অনেক কাহিনী বলবো তোমাকে একদিন।

মিস জীমস্ মীরার কথায় বনহুর ভয়ানক অবাক হলো। সে নিজেও ভেবেছিলো, জীমস্ মীরার জীবনে কোনো রহস্যময় ঘটনা আছে, তাকে দেখলে কিছুটা অনুমান করা যায়। জীমস্ মীরার ভাষা যদিও ইংলিশ কিন্তু তার চেহারা সম্পূর্ণ ইরানী মেয়েদের মত ছিলো। লম্বা ছিপ-ছিপে গড়ন, ডাগর টানাটানা দুটি চোখ। সুন্দর মসৃণ রেশমের মত একরাশ চুল। উন্নত নাসিকা, রক্তাভ গন্ডদ্বয়। গায়ের রং ধপ-ধপে সাদা নয়, ফিকে গোলাপী। জীমস্ মীরাকে দেখলে মায়া হয়, ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

বনহুর বললো—হয়তো এমন দিন নাও আসতে পারে জীমস্ মীরা, যেদিন আমি নিরিবিলি তোমার কাহিনী শুনবো। এসো তুমি আমার গুহায়, সেখানে সব বলবে।

একটা ভীতভাব ছড়িয়ে পড়লো জিমস্ মীরার মুখের উপরে। ভয়বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো চারদিকে, তারপর ফিসফিস করে বললো—এরা টের পেয়ে গেছে আমি বন্দীর সঙ্গে মিশেছি।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—এতো ভয় পাচ্ছো কেন?

তুমি জানো না, তুমি চেনো না জ্যামস্ বাবাকে।

কোনো বাবাই আমার কাছে এগুতে সাহসী হবে না মীরা। তুমি নির্ভয়ে চলো আমার গুহায়। বনহুর মীরার হাত ধরে নিয়ে চলে নিজের গুহায়।

মিস মীরা ফ্যাকাশে মুখে বনহুরের পাশে এসে বসে।

বনহুর বলে—এবার বলো, যে কাহিনী তুমি আমাকে শোনাবে বলেছিলে?

মিস জীমস্ মীরার চোখ দুটো ছলছল হয়ে উঠলো, হয়তো বা তার এমন কোনো কথা মনে পড়ছে যা তাকে অত্যন্ত বিচলিত, বেদনাক্লিষ্ট করে তুলছিলো।

বনহুর নিজের হাত দিয়ে জীমস্ মীরার অশ্রু মুছে দিয়ে বললো—আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার ব্যথা। বলো যদি কোনো উপকার করতে পারি?

বনহুরের সহানুভূতিপূর্ণ কথায় জীমস্ মীরার মনটা কানায় কানায় ভরে উঠলো, উচ্ছল কণ্ঠে বললো—পারবে তুমি আমাকে এদের কবল থেকে উদ্ধার করতে? পারবে......

পারবো মিস মীরা! পারবো.....গম্ভীর স্থির কণ্ঠে বললো বনহুর।

মীরা আত্মহারা হয়ে বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বললো—আমার বাবার অনেক রত্ন আছে। আমি তোমাকে, দেবো.......

নির্জন নিস্তব্ধ গুহায় জীমস্ মীরাকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পেয়ে নিজকে সংযত রাখতে পারলো না বনহুর। একজন পুরুষের পক্ষে এমন একটা মুহূর্তে নিজকে শক্ত রাখা দুরূহ। বনহুরের বাহু দুটি জীমস্ মীরাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করলো। জীমস্ মীরার দেহটা বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে শিথিল হয়ে আসছে ক্রমান্বয়ে। ওর মুখখানা তুলে ধরলো সে নিজের মুখের কাছে। কেমন যেন মোহগ্রস্তের মত অভিভূত হয়ে পড়েছে বনহুর ধীরে ধীরে। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে জীমস্ মীরার দৃষ্টির সঙ্গে। রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বনহুর, ঠিক সেই ক্ষণে তার বিবেক প্রতিবাদ জানালো.....না না, এ তুমি কি করতে যাচ্ছো বনহুর.....নিজকে কলুষিত করতে চলছো....তুমি না সংযমী পুরুষ....বনহুর জীমস্ মীরাকে মুক্ত করে দিলো, বললো—আজ যাও জীমস্ মীরা। আজ যাও তুমি!

শুনবে না আমার কাহিনী।

এখন নয় জীমস্, তুমি যাও—যাও।

বিস্মিতা হতবাক জীমস্ মীরা বনহুরের নিকট হতে সরে দাঁড়ালো। তারপর বেরিয়ে গেলো গুহা থেকে!

বনহুর গুহার মেঝেতে পায়চারী করতে লাগলো, সত্যি সে কতোবড় অন্যায় পথে পা বাড়াতে যাচ্ছিলো। কতোবড় একটা চরম অভিশাপ থেকে সে যেন মুক্তি পেলো আজ।

বনহুর একসময় তার শয্যা গদি-আঁটা সোফায় বসে পড়লো।

এ গুহায় বন্দী হবার পর থেকে বনহুর লম্বামত সোফাটা শয্যার জন্য ব্যবহার করতো, কারণ এ গুহায় কোনো শয়নোপযোগী বস্তু ছিলো না। কোনো অসুবিধা হতো না বনহুরের, কারণ তার সবকিছু অভ্যাস আছে। সোফার একটি হাতলে মাথা রেখে পা দু'খানা আর এক হাতলে তুলে দিয়ে আরামে ঘুমাতো।

আজও বনহুর সোফায় গা এলিয়ে দিলো অন্যান্য দিনের মত। কিন্তু ঘুমাতে পারলো না, নানারকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো তার মাথার মধ্যে।

হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এলো, অতি তীব্র অথচ ক্ষীণ আওয়াজ।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সোফার শয্যা ত্যাগ করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, মনটা যেন আচম্বিতে শিউরে উঠলো তার, তবে কি মিস জীমস্ মীরার কিছু ঘটলো? বনহুর ক্ষিপ্রহস্তে ডুবুরী-ড্রেস পরে নিলো, তারপর বেরিয়ে এলো দ্রুত গুহা থেকে।

প্রথমে সে জীমস্ মীরার গুহায় প্রবেশ করলো, কিন্তু জীমস্ মীরার শয্যা শূন্য। বনহুর তাকালো গুহার মধ্যে চারদিকে, কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না। কিন্তু নারীকণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। বনহুর এবার অপর দিকে এগিয়ে গেলো। হঠাৎ নজরে পড়লো, গুহাটার ওদিকে ফাটলের মতো একটা সুড়ঙ্গপথ আছে। বিলম্ব না করে কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা খুলে নিলো, এগুলো সন্তর্পণে।

কিছুটা অগ্রসর হতেই কানে এলো স্পষ্ট গোঙ্গানির শব্দ।

বনহুর আরও দ্রুত পা চালালো।

গুহার ওপাশে ফাটলের মধ্য দিয়ে গোঙ্গানির শব্দটা আসছে। বনহুর ফাটলটার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলো। ওপাশের গুহাটাই সেই গুহা, যে গুহার মধ্যে বনহুরকে বন্দী করে প্রথম দিন আনা হয়েছিলো। বনহুর দেখলো, মিস জীমস্ মীরাকে একটা লম্বা পাথরখণ্ডের সঙ্গে বেঁধে চাবুক মারা হচ্ছে। তার দেহের জামাটা চাবুকের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

দেহের কতক অংশ কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তাজা লাল রক্তে মিস জীমস্ মীরার নীলাভো জামার অংশগুলো টকটকে লাল দেখাচ্ছে। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে অসহায়া তরুণী জীমস্ মীরা। মাথাটা ঝুলছে সামনের দিকে, হাত দু'খানা দু'পাশে রশি দিয়ে বাঁধা। দেহটাও নেতিয়ে পড়েছে, তবু চাবুকের পর চাবুক পড়ছে তার দেহে।

গোঙ্গানি থেমে গেছে, আর কোনো শব্দ বের হচ্ছে না জীমস্ মীরার কণ্ঠ থেকে।

আর্লিং ও স্মিয়ং দু'পাশে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বলিষ্ঠ জামকালো লোক চাবুক চালাচ্ছে অবিরত। বনহুর চমকে উঠলো, ওপাশে আর একজনকে দেখে—কি ভীষণ চেহারার লোক! মানুষ না গরিলা বুঝা যায় না। দেহের চামড়াটা ধবধবে সাদা কিন্তু আকারে ঠিক একটা বিরাট হাতির মত। লাল দু'টি চোখ যেন আগুন ছড়াচ্ছে।

বনহুর নিশ্বাস বন্ধ করে লক্ষ্য করছে সব। হঠাৎ তার কানে গেলো, যে লোকটা চাবুক চালাচ্ছিলো সে বলে উঠলো—জীমস্ বাবা, বলুন শেষ করে দেই?

আর্লিং বললো—মরে গেছে মনে হচ্ছে।

কর্কশ ধেড়ে গলায় গর্জে উঠলো—ওর দেহটা চাবুকের আঘাতে ছেঁড়া কাপড়ার মত কুটোকুটো করে দাও।

ওপাশ থেকে মিস এ্যালিন বললো—বন্দীর সঙ্গে যে ভালবাসা করতে পারে তাকে বিশ্বাস নেই জীমস্ বাবা। মীরাকে হত্যা করাই শ্রেয়।

জ্যামস্ বাবা মিস এ্যালিনের কথায় খুশি হয়েছে বলে মনে হলো। [illegible] হুড়রর বলে কেমন যেন বিদঘুটে শব্দ করলো, তারপর বললো—ঠিক বলেছো এ্যালিন, এবার আমি তোমাকে রাণী করবো। শেষ করে ফেলো [illegible]।

স্মিয়ং বললো—জীমস্কে হত্যা করে তার বাবার কাছে কি জবাব [illegible] জ্যামস্ বাবা?

জবাব দেবার পূর্বেই আমি তাকে হত্যা করবো কারণ এখন সে আমার [illegible]।

মিস এ্যালিন অবাক হয়ে আরও সরে এলো, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে [illegible] ইরান শাহ্ আপনার বন্দী?

হাঁ, কিউকিলা দ্বারা তার সমস্ত কিছু ধ্বংস করে তাকে বন্দী করেছি। সে এখন ইরান সাগরের তলায় তারই রত্ন-ভান্ডারে রক্ষীর কাজ করছে। তাকে হত্যা করতে আমার কতক্ষণ! হাঃ হাঃ হাঃ, ইরান শাহ বন্দী—তার কন্যা আমার বন্দিনী—তার রত্ন-ভান্ডার আমার হাতের মুঠায়.......

মিস এ্যালিনের দু'চোখ কপালে উঠেছে যেন, বললো—ইরান শাহের রত্ন-ভান্ডার আপনি আত্নসাৎ করতে পেরেছেন জ্যামস্ বাবা?

হাঁ হাঁ, সব আমার দখলে এখন। বললো জ্যামস্ বাবা।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে শুনলো সব কথা। উষ্ণ হয়ে উঠলো ওর ধমনীর রক্ত—মনে পড়লো, মিস জীমস্ মীরা বলেছিলো, জ্যামস্ বাবাকে তুমি চেনো না, কতো বড় সাংঘাতিক সে.....আরও বলেছিলো তোমাকে আমার সব কাহিনী বলবো একদিন......এখন সব স্পষ্ট হয়ে উঠে বনহুরের কাছে। মিস জীমস্ মীরা ইরান শাহের কন্যা। তাকে চুরি করে কিংবা জোর করে ধরে এনে এখানে মিথ্যা রাণী সাজিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছে। শয়তান জ্যামস্ বাবার বাধ্য অনুগত জীব ঐ ভয়ঙ্কর জলদৈত্য কিউকিলা, ভাবতেই যেন বনহুর স্তম্ভিত হলো। কিন্তু এখন ভাববার সময় কই, মিস জীমস্ মীরাকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে।

পুনরায় আঘাত করবার জন্য চাবুক হস্তে লোকটা যেমন তার চাবুক উত্তোলন করলো, সঙ্গে সঙ্গেই বনহুরের হস্তের সুতীক্ষ্ণধার ছোরা এসে বিদ্ধ হয় তার পিঠে। আর্তনাদ করে উঠে পাক খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় লোকটা জ্যামস্ বাবা পায়ের কাছে।

তৎক্ষণাৎ জ্যামস্ বাবার আদেশ করলো—আর্লিং, স্মিয়ং, দেখো তো, কে কোথা থেকে এভাবে ছোরা নিক্ষেপ করলো? তাকে পাকড়াও করে এনে এই ছোরা দিয়েই হত্যা করো।

মিস এ্যালিন বলে উঠলো—পাতাল রাজ্যে কে আসবে আবার, নিশ্চয়ই সেই বন্দী.......

মিস এ্যালিনের কথা শেষ হয় না, বনহুর আর একখানা ছোরা হস্তে আচমকা আক্রমণ করে জ্যামস্ বাবাকে।

জ্যামস্ বাবা ঘুরে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে এক মুষ্টি বসিয়ে দেয় বনহুরের নাকের উপর। বনহুর ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়ে দূরে। সেকি ভীষণ শক্তি জ্যামস্ বাবার দেহে, যেন দৈত্যরাজ!

বনহুর পড়ে যায় মাটিতে।

জ্যামস্ বাবা ছুটে গিয়ে তার হাতির মত একখানা পা তুলে দেয় গলার উপর। চাপ দেয় দেহের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে। বনহুরের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। মরিয়া হয়ে বনহুর জ্যামস্ বাবার পা ধরে খুব জোরে প্যাঁচ দেয়, দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সে।

জ্যামস্ বাবার দেহটা মোচড় খেয়ে ধপ করে পড়ে যায় ভূতলে। বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ায়, টিপে ধরে জ্যামস্ বাবার গলা।

জ্যামস্ বাবা তার ডান হাত দিয়ে খামচে ধরে বনহুরের চুলের মুঠি, পরক্ষণেই একটা মুষ্ট্যাঘাৎ বসিয়ে দেয় সে বনহুরের চোয়ালে।

বনহুর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। জ্যামস্ বাবা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে, বনহুরকে জাপটে ধরে ফেলে।

বনহুরও জড়িয়ে ধরে জ্যামস্ বাবাকে, পরপর কয়েকটা ঘুঁষি লাগায় তার নাকে-মুখে-চোয়ালে। বনহুরের বজ্রমুঠির আঘাতে জ্যামস্ বাবার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। চিৎ হয়ে পড়ে যায় গুহার মেঝেতে।

বনহুর দ্রুত হস্তে জ্যামস্ বাবার নিহত অনুচরের বুক থেকে তুলে নেয় সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা তারপর জ্যামস্ বাবার বুকে ক্ষিপ্রহস্তে বসিয়ে দেয় সমূলে।

আঃ.....একটা অদ্ভুত আর্তনাদ করে উঠে জ্যামস্ বাবা—সঙ্গে সঙ্গে মিস এ্যালিন চিৎকার করে উঠলো—সর্বনাশ, জ্যামস্ বাবা নিহত হয়েছে! জ্যামস্ বাবা নিহত হয়েছে!

আর্লিং আর স্মিয়ং ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, মিস এ্যালিনের চিৎকারে আরও কয়েকজনসহ ছুটে এলো তারা!

বনহুর এবার তার ডুবুরী ড্রেসের মধ্য হতে বের করে নিলো ক্ষুদে অটোমেটিক পিস্তলখানা। পরপর গুলী ছুঁড়লো সে এক-একজনকে লক্ষ্য করে।

অব্যর্থ লক্ষ্য বনহুরের, একটি গুলীও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। আর্লিং আক্রমণ করবার পূর্বেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। পরক্ষণেই রুখে এলো স্মিয়ং ছোরা হস্তে, কিন্তু সেও বনহুরের নিকট পৌঁছতে পারলো না। আরও কয়েকজন এলো কিন্তু তারা কেউ রক্ষা পেলো না, সবাই মৃত্যুবরণ করলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখে আর একটি প্রাণীও জীবিত নেই। কিন্তু মিস এ্যালিন কোথায়? বনহুর একবার ঐ কালো পাথরখন্ডের সঙ্গে বাঁধা মিস

জীমস্ মীরার সংজ্ঞাহীন দেহটার দিকে। এগিয়ে গেলো সে তার পাশে—ঐ মুহূর্তে কেমন যেন একটা শব্দ শুনতে পেলো বনহুর, কোনো গ্যাস প্রয়োগের শব্দ বলেই মনে হলো তার।

বনহুরের দেহে ডুবুরী ড্রেস থাকলেও তার মুখের আবরণ উন্মোচিত ছিলো, সে অনুভব করলো—তার নিশ্বাস নিতে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে। বনহুর একদন্ড বিলম্ব না করে অক্সিজেন পাইপসহ মুখোশটা পরে নিলো, তারপর অতি দ্রুতহস্তে খুলে ফেললো মিস মীরার দেহের বন্ধন, তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো সেই গুহা থেকে। যে গুহায় বনহুরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো সেই গুহায় মিস জীমস্ মীরাকে নিয়ে প্রবেশ করলো। ওকে একটি সোফায় শুইয়ে দিয়ে নিজের মুখের মুখোশ খুলে ফেললো। তাকালো বনহুর মিস জীমস্ মীরার সংজ্ঞাহীন অসহায় করুণ মুখখানার দিকে। দেহের বসন ছিন্নভিন্ন, রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে স্থানে স্থানে, দেহের প্রায় সমস্ত অংশই বনহুরের দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে!

বনহুর একটি তোয়ালে নিয়ে চাপা দিলো তার দেহটা। কিন্তু এখন বিলম্ব করার সময় কোথায়—এ গুহাটার মধ্যেও গ্যাস আসছে। বনহুর দ্রুত বেরিয়ে গেলো, যাবার সময় মুখোশটা পরে নিলো সে ভালভাবে।

ফিরে এলো বনহুর সে গুহায় দেখলো, একটা ধূম্ররাশির মত গ্যাস সমস্ত গুহাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে বনহুর বুঝতে পারলো, কেউ কোনো স্থান হতে বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ছে। এগুলো বনহুর সামনের দিকে, অমনি হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলো। জ্যামস্ বাবার মৃতদেহের সঙ্গে হোঁচট খেয়েছিলো, একটু হলেই মুখ থুবড়ে পড়ে যেতো। বনহুর দেখলো, গুহামধ্যে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে তারই হস্তে নিহত লোকগুলো। একনজর তাকালো বনহুর মৃতদেহগুলোর দিকে, তারপর ফাটল ধরনের গুহামুখ দিয়ে প্রবেশ করলো।

প্রথম দিন বনহুর গুহার মধ্যে অনেকরকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম লক্ষ্য করেছিলো—তবে কি এই গুহা থেকেই কোনো বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া হচ্ছে! কে জানে কে সে শয়তান, নিশ্চয়ই সে তাকে এবং জীমস্ মীরাকে হত্যা করার জন্যই এভাবে গুহায় বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে অক্সিজেন নষ্ট করে দিচ্ছে।

বনহুর গুহাটার মধ্যে প্রবেশ করে তাকালো চারদিকে কিন্তু এতো বেশি গ্যাস ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়ায় তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বনহুর ভালভাবে তাকালো চারদিকে। হঠাৎ চমকে উঠলো, দেখলো একটি

টেবিলে নানারকম মেশিন বসানো আছে, একটা যন্ত্রের উপরে হাত রেখে উঁচু হয়ে পড়ে আছে মিস এ্যালিন।

বনহুর সব বুঝে নিলো, তৎক্ষণাৎ মিস এ্যালিনকে চিৎ করে ফেললো দেখলো তার দেহে আর জীবন নেই। মিস এ্যালিনের হাতের নিচে যে সুইচটা অন করা ছিলো বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে অফ্ করে দিলো। একটা সাঁ সাঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো। বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো, মিস এ্যালিন তাকেই হত্যা করার জন্য পালিয়ে এসে বিষাক্ত গ্যাসের সুইচ চালু করে দিয়েছে! কিন্তু সে নিজের মুখে কোনো মুখোশ বা অক্সিজেন পাইপ পরে নিতে ভুলে গেছে এবং সেই কারণেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তাকে।

এবার বনহুর ফিরে এলো আবার তার সেই বন্দী গুহায়। মিস জীমস্ মীরার সংজ্ঞা তখনও ফিরে আসেনি। যেমনটি বনহুর রেখে গেছে তেমনি পড়ে আছে সোফার মধ্যে। হাত দু'খানা ছিন্ন লতার মত নিতিয়ে আছে দু'পাশে।

এ গুহায় বিষাক্ত গ্যাস এখনও তেমনভাবে প্রবেশ করেনি তাই রক্ষা, না হলে মিস জীমস্ মীরাকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব হতো না।

বনহুর এবার নিশ্চিন্ত, সাগরতলের জ্যামস্ বাবার সবগুলো অনুচরকে নিঃশেষ করে ফেলেছে সে। এখন তাকে আর কেউ বাধা দিতে আসবে না কোন কাজে। মিস এ্যালিনও নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছে। বনহুর নিজের দেহ থেকে ডুবুরী ড্রেস খুলে ফেললো। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো বনহুর, একসঙ্গে এতোগুলোকে পরাজিত করে হত্যা করা কম কথা নয়। জ্যামস্ বাবার মত এক রাক্ষসের পাল্লায় পড়েও সে নিজকে রক্ষা করতে পেরেছে এবং তাকে নিহত করতে সক্ষম হয়েছে। বিষাক্ত গ্যাসের ক্রিয়া তাকে অনেকটা কাবু করে ফেলেছিলো। বনহুর দেহের বসন মুক্ত করে নিজেকে অনেকটা শান্ত সুস্থ করে নিলো। কিন্তু বেশীক্ষণ এখানে বিলম্ব করা যায় না। মিস জীমস্ মীরার সংজ্ঞা ফিরে না এলে কিছু করতে পারছে না। ফিরে তাকালো বনহুর জীমস্ মীরার দিকে।

এগিয়ে এলো ওপাশ থেকে, ডান হাতখানা দিয়ে জীমস্ মীরার কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলো আলগোছে। নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

নিজের মধ্যে একটা দুর্বলতা অনুভব করছে বনহুর। জীমস্ মীরার সৌন্দর্য তাকে অধীর করে তুলছে, কিছুতেই নিজকে সংযত রাখতে পারছে না। ঠিক সেই মুহূর্তে তার কানের কাছে ভেসে এলো মনিরার কণ্ঠস্বর.....একি করছো মনির,—নিজকে সংযত করে নাও.....। বনহুর আবার শুনতে পেলো নূরীর কণ্ঠ.....না না, ভুল করো না, যদিও আমরা তোমার পাশে নেই কিন্তু আমাদের স্মৃতি তোমার চারপাশ ঘিরে আছে, ভুল করো না হুর......ভুল করো না হুর.......

বনহুর সরে এলো মিস জীমস্ মীরার পাশ থেকে।

পায়চারী করতে লাগলো, নিজের চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে লাগলো দ্রুতগতিতে। মনকে সে কঠিনভাবে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো।

হঠাৎ মিস জীমস্ মীরা নড়ে উঠলো, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—পানি......

বনহুর তখনই পানির গেলাসটা নিয়ে এগিয়ে গেলো—এই নাও পানি জীমস্ মীরা।

জীমস্ মীরা উঠতে গেলো কিন্তু পারলো না—ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠলো উঃ মাগো—মাগো......

বনহুর বামহস্তে ধরলো জীমস্ মীরাকে আর দক্ষিণ হস্তে পানির গেলাসটা চেপে ধরলো তার ঠোঁটের কাছে—খাও জীমস্ মীরা।

জীমস্ মীরা ব্যাকুল আগ্রহে পানি পান করলো। তার কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো। পানি পান করে তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো, বললো—আমার কি হয়েছিলো বন্দী?

বনহুর তাকে ধীরে ধীরে সোফায় শুইয়ে দিয়ে বলল—বন্দী নয়, তুমি আমাকে বন্ধু বলে ডাকবে। কারণ আমি আর বন্দী নেই তোমাদের।

বন্ধু—বেশ, বন্ধু বলেই ডাকবো। কিন্তু আমার এ অবস্থা কেন?

সব ভুলে গেছো এরি মধ্যে?

জীমস্ মীরা ব্যথাভরা কণ্ঠে বললো—আমি ঘুমিয়েছিলাম, তখন কারা যেন আমাকে বেঁধে ফেললো। আমি ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি......

স্বপ্ন নয়—সত্য।

সব সত্য?

হ্যাঁ, দেখছো না তোমার দেহের অবস্থা?

উঃ সমস্ত দেহে আমার রক্ত! আমার জামা ছিঁড়ে গেছে কেন?

তুমি রাণী, তাই তোমার প্রাপ্য ছিলো এসব। গভীরভাবে চিন্তা করলেই সব মনে পড়বে তোমার।

মিস জীমস্ মীরা একটু ভাবলো, তারপর হঠাৎ বলে উঠলো—সব মনে পড়েছে আমার। বন্ধু, জ্যামস্ বাবা....জ্যামস্ বাবা আমাকে হত্যা করবে, আমাকে হত্যা করবে! উঠতে গেলো মিস জীমস্, মীরা!

ধরে ফেললো বনহুর, সান্ত্বনার স্বরে বললো—জীমস্, আর ভয় নেই তোমার। জ্যামস্ বাবা এবং তার দলবলকে আমি হত্যা করেছি।

অবাক হয়ে তাকালো জীমস্ মীরা, বনহুরের কথা সে যেন বিশ্বাস করতে পারলো না।

বনহুর বললো—তুমি নিশ্চিন্ত জীমস্। আর কেউ তোমাকে শাস্তি দিতে আসবে না। আমি নররাক্ষস জ্যামস্ বাবা ও অন্যান্য সবাইকে নিঃশেষ করেছি।

মিস এ্যালিন—সে কোথায়?

সে শয়তানীও নিজেই মৃত্যুবরণ করেছে। বললো বনহুর।

কিভাবে সে বিষ গ্যাস ছাড়তে গিয়ে নিজেই তার শিকার হয়েছে, সব খুলে বললো মিস জীমস্ মীরার কাছে বনহুর!

অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো মিস জীমস্ মীরা, নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পাচ্ছিলো সে। কারণ ছেঁড়া বসন ভেদ করে তার দেহের অংশগুলো বেরিয়ে পড়েছিলো।

বনহুর নিজের হাতে তোয়ালেটা মিস জীমস্ মীরার দেহে জড়িয়ে দিলো, একটু হাসলো বনহুর মুখ টিপে—হাজার হলেও জীমস্ মীরা নারী তো, আর সে পুরুষ, কাজেই লজ্জা পাবার কথাই বটে!

মিস জীমস্ মীরার পাশের সোফায় বসে বললো বনহুর—জীমস্ এখন তুমি শোনাতে পারো তোমার সেই কাহিনী।

কিন্তু.......থেমে গেলো জীমস্ মীরা।

থামলে কেন, বলো কি বলতে চাও তুমি?

অনেক সময় লাগবে বলতে, তাই বলছিলাম পরে বলবো।

না, তুমি সংক্ষেপে বলো জীমস্ কারণ আমি সেই ভেবে কাজ করবো।

জীমস্ মীরা বলতে শুরু করলো—আমার বাবা ইরানের বাদশাহ ছিলেন, তাঁর নাম শাহ নাশাদ। আমার বাবার একমাত্র কন্যা আমি। বাবার রাজ্য ছাড়াও তিনি এক দ্বীপের অধিকারী ছিলেন, সে দ্বীপ ছিলো ইরান সাগরের নিভৃত এক অংশ। কেউ সে দ্বীপের সন্ধান জানতো না আমার বাবা ছাড়া। বাবা মাঝে মাঝে ঐ দ্বীপে যেতেন, বহু রত্ন নিয়ে ফিরে আসতেন এবং সেইসব রত্ন বিক্রয় করে ইরানের দীন-দুঃখী-অসহায়দের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। বাবা কোনো গরিব লোককে দেখলে প্রায় কেঁদে ফেলতেন, তিনি ভুলে যেতেন তিনি একজন বাদশাহ। সেই দীনহীন ব্যক্তিকে নিজের পাশে বসিয়ে শুনতেন কি তার অভাব বা কষ্ট। তারপর সাধ্যমত তার কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন......

বনহুর মুগ্ধ নয়নে শুনছিলো মিস জীমস্ মীরার কথাগুলো, বড় সুন্দর মিষ্টি লাগছে ওর কথার প্রতিটি শব্দ, বললো—বলো জীমস তারপর?

একদিন আমার বাবার কাছে এক ইংরেজ বণিক এসে হাজির হলো, কেঁদে-কেটে বললো—জাহাজডুবি হয়ে সর্বহারা পথের ভিখারী হয়েছে। এক মুষ্টি অন্নের জন্য আজ সে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবার মহৎ হৃদয়ের কথা জানতে পেরে সে নাকি এসেছে বাবার কাছে। বাবা তার ছিন্ন মলিন পোশাক দেখে, তার কথা শুনে অনেক দুঃখ করলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিলেন—তিনি পুনরায় তার বাণিজ্য উপযোগী অর্থ দেবেন!

বাবা তাকে মহলে আশ্রয় দিলেন এবং তিনি তাকে খুব আদরযত্ন করলেন। এতো ছোটখাটো অর্থের প্রয়োজন নয়, বাবা একদিন জাহাজ নিয়ে ইরান সাগরে পাড়ি জমালেন, ফিরে এসে বণিককে তার বাণিজ্য উপযোগী অর্থ দেবেন বলে গেলেন!

কিন্তু বাবা সেই যে ইরানসাগরে জাহাজ ভাসালেন আর ফিরে এলেন না। আমরা আশ্চর্য হলাম, বাবা যেদিন বিদায় নিলেন ঐদিন বণিকটাও নিরুদ্দেশ হয়েছে, তাকেও আর দেখা গেলো না।

বনহুর আগ্রহভরা কণ্ঠে বললো—তারপর?

তারপর সমস্ত ইরান যখন বাদশাহর অন্তর্ধানে মর্মাহত তখন এক ভয়ঙ্কর জীবের আবির্ভাব ঘটলো—ঐ জীব কিউকিলা। ইরানসাগর থেকে গভীর রাতে এই জীব উঠে আসতো এবং বাড়িঘর চুরমার করে লোকজনদের ধরে রক্ত পান করতো।

ইরানবাসী যখন এই ভয়ঙ্কর জীব কিউকিলার অত্যাচারে অতিষ্ঠ তখন একদিন সেই বণিক এসে হাজির হলো রাজপ্রাসাদে। আমার বাবার মন্ত্রীবরকে বললো—তোমরা যদি শাহজাদী মীরাকে দাও তাহলে ঐ জীব আর তোমাদের উপর অত্যাচার করবে না।

রাজ্যরক্ষার জন্য মন্ত্রী গোপনে আমাকে সমর্পণ করলো সেই শয়তান ইংরেজ বণিকের হাতে। বণিক আমাকে নিয়ে কোথায় এলো আমি জানি না—জ্ঞান হলে দেখলাম, আমার বাবাকে শিকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে তার দেহে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা বিদ্ধ করা হচ্ছে। বাবা যন্ত্রণায় করুণ আর্তনাদ করছেন আর বলছেন, আমি বলবো না কিছুতেই, আমার রত্ন ভান্ডারের সন্ধান তোমাকে দেবো না।

দেখলাম বাবার মুখেচোখে সেকি নিদারুণ বেদনাপূর্ণ ভাব। শুকিয়ে গেছে, মুখের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। দেহটা কঙ্কালের মত হয়ে পড়েছে। একটি বছর ধরে চলেছে তাঁর উপরে এই কঠিন নির্মম শাস্তি। বাবাকে দেখে আমি কেঁদে আকুল হলাম।

বাবা আমাকে দেখে কাঁদলেন না, তার নিজের অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি যেন ভুলে গেছেন সবকিছু, রীতিমত কাঁতরাচ্ছেন তিনি তখন!

শয়তান বণিক তার হাতির মত হাতখানা দিয়ে আমাকে ধরলো, তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো ওদিকের অগ্নিকুন্ডটার দিকে, বললো—এবার এর পালা।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন আমাকে বেঁধে ফেললো।

আমি ভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছি।

বাবা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। কিন্তু তিনি কিছু বলছেন না।

আমাকে ওরা শক্ত করে একটা লোহার থামের সঙ্গে বেঁধে ফেললো। তারপর যে লৌহশলাকা দিয়ে বাবার দেহে শেক দেওয়া হচ্ছিলো ওটা এবার নিয়ে এলো আমার দিকে।

আমি প্রাণফাটা চিৎকার করলাম—বাবা, বাবা......

এবার বাবা কথা না বলে পারলেন না, হঠাৎ বাবাও আমার মত চিৎকার করে উঠলেন—থামো, থামো আমার মেয়েকে তোমরা কষ্ট দিও না, আমি সব বলছি!

আশায় আনন্দে আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলো। আমি তাকালাম বাবার দিকে, বাবার মুখে মমতার ছাপ ফুটে উঠেছে, বাবা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

শয়তান বণিকের ইশারায় আমাকে মুক্ত করে দিলো তার ধূর্ত অনুচরগণ। বাবার বন্ধনও মুক্ত করে দিলো ওরা। বাবা ছাড়া পেয়ে আমাকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'মা মা' বলে ডাকতে লাগলেন। বাবা যখন আমাকে জড়িয়ে ধরে স্নেহ গদগদ হয়ে পড়লেন, তখন বাবার দেহে আমি এক ভীষণ উৎকট দুর্গন্ধ অনুভব করলাম, বাবাকে কতদিন ওরা স্নান করতে দেয়না। তাছাড়াও বাবার গায়ে পোড়া অংশগুলি পঁচে তারই গন্ধ বের হচ্ছিলো।

বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। অধর দংশন করতে লাগলো সে। বললো—ঐ শয়তান বণিক বুঝি তোমাদের জ্যামস্ বাবা?

হাঁ, ঠিক বলছো বন্ধু, ঐ শয়তান বণিকই জ্যামস্ বাবা—যে আমার বাবার কাছে তার রত্ন ভান্ডারের সন্ধান জেনে নিয়ে আমাকে রত্ন ভান্ডারের রাণী করতে প্রতিশ্রুতি দিলো, আর আমার বাবাকে যে কি করেছে জানি না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো জীমস্ মীরার।

বনহুর জীমস্ মীরার পিঠ চাপড়ে বললো—তোমার বাবা জীবিত, আমি নিজ কানে শুনেছি এবং ঐ রত্নভান্ডারের মধ্যেই আছেন তিনি। জীমস আর বিলম্ব করা যায় না, কিউকিলা হত্যা না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নাই!

জীমস্ মীরা বনহুরের হাতে চেপে ধরলো—তুমি ওকে মারতে পারবে বন্ধু? পারবে মারতে?

পারবো জীমস্।

সত্যি তুমি কতোবড় সাহসী, কতোবড় বীর পুরুষ। এতোগুলো শয়তানকে তুমি একা হত্যা করেছো। জ্যামস্ বাবার মত এক নর রাক্ষসকে তুমি হত্যা করেছো.....আনন্দে জিমস্ মীরার চোখ উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো একটু থেমে বললো—কিউকিলা জ্যামস্ শয়তানের শুনেছিলাম পোষা রাক্ষস। ওকে দিয়ে ঐ শয়তান যা খুশি করাতো। আমি শুনেছি,

কিউকিলাকে আরব সাগরের কোনো ডুবন্ত পর্বত থেকে জ্যামস্ বাবা কৌশলে হাতের মুঠোয় করেছিলো......

অস্ফুট ধ্বনি করে বনহুর—আরব সাগর থেকে কিউকিলাকে ঝাঁম সাগরে আনা হয়েছিলো। ঝাঁম শহরকে ধ্বংস করাই ছিলো জ্যামসের উদ্দেশ্য এবং ঝাঁম রাজ্যের অধিপতি হবার সখ ছিলো তার।

অবাক হয়ে জীমস্ তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে।

বললো বনহুর—জীমস্, তুমি কি এখন সুস্থ বোধ করছো?

হাঁ অনেকটা।

আমাকে যেতে হবে।

বনহুরের কথায় শিউরে উঠলো জীমস্ মীরা—চলে যাবে?

একেবারে নয়, কয়েক ঘন্টার জন্য।

কোথায় যাবে তুমি?

কিউকিলা হত্যার চেষ্টা করতে.........

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে বন্ধু। আগ্রহভরা কণ্ঠে বললো জিমস্ মীরা।

বনহুর বললো—সাবমেরিন নিয়ে আমাকে যেতে হবে। কাজেই তোমাকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয় জীমস্। বনহুর তার ডুবুরীর ড্রেস পরতে শুরু করলো।

জীমস্ মীরা তখন নিজের ছিন্ন ভিন্ন ড্রেসের দিকে তাকিয়ে বললো—

আমার ড্রেস ও গুহায় আছে, যদি এনে দিতে তাহলে আমি খুশি হতাম!

বনহুর জীমস্ মীরার কথামত তার ড্রেস এনে দিলো।

জীমস ড্রেস পাল্টাবার সময় লজ্জিতভাবে বনহুরের দিকে তাকাচ্ছে দেখে বনহুর হেসে বললো—আমি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি ড্রেস পরে নাও।

জীমস্ বললো—আচ্ছা পরে নিচ্ছি, তুমি ওদিকে তাকাও।

বনহুর মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

জীমস্ মীরা জামা পাল্টে নিয়ে বললো—এবার তাকাও।

বনহুর দাঁড়ালো বাধ্য ছাত্রের মত।

জীমস্ মীরা হাসলো, সে তার ব্যথা ভুলে গেছে যেন অনেকটা।

বনহুর তার ডুবুরী ড্রেস পরা শেষ করে ডিনামাইটগুলো চোরা পকেটে তুলে নিলো।

জীমস মীরার মুখ ক্রমে বিষণ্ন হয়ে আসছে।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে বিদায় চাইলো—জীমস্ চলি?

জীমস তার স্বভাবমত বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলো। তারপর পর পর কয়েকটা চুম্বন দিলো সে ওর গুন্ডদ্বয়ে।

বনহুর বাধা দিলো না বা দিতে পারলো না জীমস্ এর কাজে। সেও প্রতিদানে জীমস্ মীরার ওষ্ঠদ্বয়ে চুম্বনরেখা এঁকে দিলো গভীর আবেগে।

বনহুর সাবমেরিনে প্রবেশ করার পূর্বে ডুবুরী ড্রেস এবং অক্সিজেন পাইসপসহ মুখোশ পরে নিলো।

জীমস্ মীরা হঠাৎ কেঁদে ফেললো—তোমাকে যেতে দেবো না বন্ধু। তুমি খুলে ফেলো ও ড্রেস।

একি, তুমি কাঁদছো জীমস্!

আমাকে সঙ্গে নাও। মরতে হয় একসঙ্গে মরবো দু'জনা।

হেসে বলল, বনহুর—মরলে চলবে কি করে? তোমাকে তোমার পিতার কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমার বাঁচতেই হবে জীমস্। বনহুর মুখোশ খুলে ফেলেছিলো, আবার পরে নিলো।

বনহুর ততক্ষণে সাবমেরিনে উঠে বসেছে।

হাত নাড়লো জীমস্।

বনহুর ঢাকনা বন্ধ করে দিলো সাবমেরিনের, তারপর বেরিয়ে এলো সমুদ্রতলে গভীর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে। স্পীড বাড়িয়ে দিলো মিটারের সর্বশেষ কাঁটায় দ্রুত সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চললো বনহুরের সাবমেরিনটা। সম্মুখের পাওয়ারফুল কাঁচের ক্ষুদ্র শার্সী দিয়ে দেখছে বনহুর—তার পাশ কেটে চলে যাচ্ছে কত হাঙ্গর, কুমীর, কচ্ছপ, তিমি মাছ—আরও কত কি। নানারকমের জলীয় উদ্ভিদ এবং লতাগুল্মের মাঝ দিয়ে স্পীডে চলেছে জলযানটা।

হঠাৎ কোনো ডুবন্ত পাহাড়ে বা ঐ ধরনের পাথরে সাবমেরিন ধাক্কা না খায় সেদিকে বনহুরের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। এতো দ্রুত সাবমেরিন চলছিলো যার জন্য বনহুর এক ঘন্টার মধ্যেই তার চিহ্নিত সেই ডুবন্ত পাহাড়ের

নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো। বনহুর চিনতে পারলো, এটাই সেই পাহাড় যার বিরাট গুহায় কিউকিলাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেছিলো সে।

এতো সাবধানে এবং কৌশলে বনহুর সাবমেরিন চালনা করে এসেছে যার জন্য জলযানটা কোনো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যায়নি। তাছাড়া বনহুর সেদিন আর্লিং-এর চালনা থেকেই নিজে শিখে নিয়েছিলো। স্পীডবোট চালনার মতই কতকটা, হান্ডেল ঘুরিয়ে গতি ঠিক রাখতে হয়। কয়েকটা সুইচ রয়েছে, এই সুইচগুলো কেমন ভাবে কোনটা কখন কাজে লাগাতে হয় সব সেদিন নিপুণভাবে লক্ষ্য করে দেখে নিয়েছিলো সে, কাজেই আজ কোনো অসুবিধা হলো না।

বনহুর তার পরিচিত ডুবন্ত পাহাড়টার বেশ কয়েক মাইল দূরে থাকতেই সাবমেরিনের স্পীড কমিয়ে দিলো। তারপর স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে আসতে লাগলো গভীর জলের মধ্য দিয়ে!

দুঃসাহসী বনহুরের বুক এতোটুকু কাঁপলো না। অসীম সাহসে তার ক্ষুদ্র জলযান নিয়ে কিউকিলার আবাসস্থলের দিকে এগুচ্ছে বনহুর।

ভাগ্য তার প্রসন্ন বলতে হবে; বনহুর দেখলো ডুবন্ত, পাহাড়টার যে গুহায় একদিন কিউকিলাকে দেখেছিলো সে, আজ ঐ গুহা ফাঁকা। বনহুর বুঝতে পারলো, কিউকিলা ঝাঁম শহরে রক্তপান উদ্দেশ্যে গমন করেছে। আর বিলম্ব নয়, বনহুর সাবমেরিনসহ প্রবেশ করলো গুহার মধ্যে। অথৈ জলরাশিপূর্ণ গুহা সাবমেরিন নিয়ে অনায়াসে পৌঁছে গেলো ভিতরে।

বনহুর সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে পড়লো, ডুবুরী ড্রেস পরে সমুদ্রগর্ভে অবতরণে কোনো অসুবিধা হলো না। সাঁতার কেটে গুহার মধ্যে দেখে নিলো চারিদিক কোথায় ডিনামাইট বসালে কিউকিলাসহ পাহাড়টা ধ্বংস হয়ে যাবে। বনহুর অতি সতর্কতার সঙ্গে গুহার মধ্যে ডিনামাইট গুলো সাজিয়ে রাখলো সুন্দরভাবে। ডিনামাইটের সুইচ অন করে রাখলো। চাপ পড়লেই যাতে বিস্ফোরণ ঘটে!

বনহুর ডিনামাইট বসিয়ে সাবমেরিন নিয়ে যখন যমপুরী কিউকিলার আবাসস্থল থেকে বেরিয়ে আসছিলো তখন দৈত্যরাজ কিউকিলা তার বিরাট দেহ নিয়ে ফিরে আসছিলো নিজের গুহায়। ভাগ্যিস গুহার মধ্য থেকে

বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলো বনহুর তাই রক্ষা, নাহলে গভীর জলের তলায় বনহুর নিঃশেষ হয়ে যেতো, আর সে কোনো দিন ফিরে যেতো না পৃথিবীর বুকে।

কিউকিলার পায়ের পাশ কেটে বনহুরের সাবমেরিন বেরিয়ে এলো সমুদ্রের অথৈ জলে। এবারে আর তাকে কে পায়, স্পীডে ছুটছে জলযানটা! সাঁ সাঁ করে তার বেগে চলেছে, বনহুর সুইচ অন করে হ্যান্ডেল চেপে ধরে আছে। না জানি কোন্ মুহূর্তে পিছনে শোনা যাবে ডিনামাইট বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর শব্দটা। একটি নয়—তিনটি ডিনামাইট বসিয়ে রেখে এসেছে বনহুর।

বনহুরের সাবমেরিন কয়েক মাইল আসতে না আসতে পিছনে সমুদ্রগর্ভে ভীষণ এক আওয়াজ হলো, সঙ্গে সঙ্গে ডুবন্ত পাহাড়টা যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো চারপাশে। তোলপাড় শুরু হলো যেন—মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটা যেন ধ্বংস হয়ে গেলো।

ডুবন্ত পাহাড়টার পাথরখন্ডের সঙ্গে বনহুরের সাবমেরিনখানা ধাক্কা খেলো প্রচন্ডভাবে। বনহুর তবু সংজ্ঞা হারালো না বা সাবমেরিনের হ্যান্ডেল ছেড়ে দিলো না। শক্ত হাতে ধরে রাখলো, যেমন করে হোক নিজে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে অসহায় জীমস্ মীরাকে।

পরবর্তী বই

ইরান সাগরে দস্যু বনহুর

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই